গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৪ বর্ষ ৩৭ সংখ্যা | ১৮ - ২৪ মে, ২০১২ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা

হিলারিরা ভারতবাসীর কল্যাণের জন্য আসে না

মার্কিন বিদেশ সচিব হিলারি ক্লিন্টন কলকাতা ঘুরে গেলেন। বৈঠক করে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর সঙ্গে। তাতেই মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে সরকারি নেতা-মন্ত্রীরা, সংবাদমাধ্যমগুলি এমন হইচই ফেলে দিয়েছে যেন, বাংলায় আর রবে না দুঃখ, রবে না দারিদ্র, রবে না বেকারি। এ বার শুধুই এগিয়ে যাওয়ার পালা। রাজকীয় সংবর্ধনা দিয়ে ও একান্ত বৈঠক করে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বললেন, 'গর্ব করার মতো ঘটনা'। মানবসভ্যতার এক নম্বর দুশমন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এক মুখ্য প্রতিনিধির সফরে 'গর্ব' অনুভব করার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদকে তোষণ করার মানসিকতা ছাড়া আর কী থাকতে পারে!

হিলারির সফর নিয়ে মিডিয়ার প্রচার যতই তুঙ্গে উঠুক, সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন বা ব্রিটিশ কর্তাব্যক্তিদের এ ধরনের বঙ্গসফর এই প্রথম নয়। সিপিএম আমলেও তাঁরা এসে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে বৈঠক করেছিলেন। বৈঠক শেষে আজকের মতোই প্রত্যেক মুখ্যমন্ত্রী স্মিত হেসে বঙ্গবাসীকে আশ্বস্ত করেছিলেন, আর চিন্তা নেই। এই তো, উনি ঘুরে গেলেন। অর্থাৎ ত্রাতা হিসেবে এঁদের দেখানোর চেষ্টা আগেও হয়েছে।

২০০৭ সাল। ভারত সফরে আসা মার্কিন অর্থ সচিব হেনরি পলসনের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন তখনকার মুখ্যমন্ত্রী সিপিএম পলিটবুরো সদস্য বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। আলোচনা হয়েছিল এ রাজ্যে মার্কিন বিনিয়োগ নিয়ে। ততদিনে সিপিএম নেতারা অবশ্য ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, পুঁজির কোনও রঙ হয় না। এই বৈঠকের বিস্তৃত বিবরণ পরবর্তীকালে উইকিলিকসে ফাঁস হয়। দেখা যায়, মুখ্যমন্ত্রী মার্কিন সচিবকে এ রাজ্যে আরও বেশি বিনিয়োগের জন্য আবেদন করছেন। এমনকী ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনায় হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী ইউনিয়ন কার্বাইড কিনে নেওয়া মার্কিন বহুজাতিক কুখ্যাত ডাও কেমিক্যালকে এ রাজ্যে বিনিয়োগ করাতে পলসনকে বুদ্ধদেববাবু পীড়াপীড়ি করেছেন। মার্কিন পুঁজি বিনিয়োগে তাঁর আগ্রহ বোঝাতে পলসনকে এমনও বলেছিলেন যে, পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে তাল রেখে 'কমিউনিস্টদের' বদলাতে হবে, না হলে মুছে যেতে হবে। অর্থাৎ, সরকারি গদিলাভের পর পরিবর্তিত পরিস্থিতি অনুযায়ী সিপিএম নেতারা নিজেদের বদলে নিয়েছেন। বাইরে মুখে যা-ই বলুন, অন্তরে আর তাঁরা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নন, বরং 'উন্নয়নের জন্য' মার্কিন পুঁজির পথ চেয়েই বসে আছেন।

সিপিএম মুখ্যমন্ত্রী মার্কিন বিনিয়োগ নিয়ে প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত রবার্ট ব্ল্যাকউইলের সাথেও বৈঠক করেছিলেন। তাঁর পূর্বসূরী জ্যোতি বসু ১৯৯৭ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জন মেজরকে এবং ২০০০ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টনকে ধরে এনেছিলেন বিনিয়োগের জন্য। সেদিন তাঁদেরও এমন করেই বাংলার ত্রাণকর্তা হিসেবে দেখানোর চেষ্টা হয়েছিল। বাস্তবে এই সব সফর বাংলার মানুষের কোনও কাজেই লাগেনি। রাজ্য জুড়ে দারিদ্র, বেকারি, অশিক্ষা, বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু, বন্ধ কারখানার সমস্যা যেমন ছিল তেমনই থেকেছে। শুধু কিছু ক্ষেত্রকে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির লুঠের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। ইরাক আক্রমণের সময় সিপিএম রাস্তায় মিছিল করলেও, পেপসি-কোকাকোলার মতো পানীয় বয়কট করে প্রতীকী প্রতিবাদেও রাজি হননি নেতারা। কারণ তাদের ভয়

আটের পাতায় দেখুন

বিদ্যুতের দামবৃদ্ধির প্রতিবাদে মহাকরণ অভিযান

বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদে সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির ডাকে ৩ মে মহাকরণ অভিযান

যোজনা কমিশনের নয়া ভেলকি

দশ-বারো বছরে নাকি ভারতে গরিব থাকবে না

আগামী ২০২০ বা ২০২২ সাল — আর বড় জোর দশ কি বারো বছর। ব্যস। তারপর গরিব বলে কেউ থাকবে না এই ভারত ভূখণ্ডে। এইভাবে দিনক্ষণ পর্যন্ত ঘোষণা করে দিয়েছে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রের ইউপিএ সরকারের যোজনা কমিশন। সরকারি এই ঘোষণার অর্থ কী? এর দুটো অর্থ হয়। এক, দেশের সব গরিব মানুষ আরও দ্রুত হারে অনাহারে, রোগে ভুগে, নয়তো আত্মহত্যা করে শেষ হয়ে যাবে, দেশে গরিব বলে আর কেউ থাকবে না। দুই, সরকার এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, যাতে দেশের গরিব মানুষের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটে যাবে, দেশ থেকে গরিবির অবসান ঘটে যাবে। ধরা যাক, সরকার দ্বিতীয় অর্থটিই বোঝাতে চাইছে। অর্থাৎ আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে দেশ থেকে গরিবি চিরতরে হটিয়ে দিতে চাইছে।

স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুও সেদিন আশার বাণী শুনিয়েছিলেন দেশবাসীকে — শিশুরাষ্ট্র, সবেমাত্র স্বাধীনতা লাভ করেছে, একটু সময় দিন, দারিদ্র-অনাহার-লাচারির অবসান হবে দেশ থেকে। তার বছর বিশেক বাদে ১৯৭০-এর দশকে সরাসরি 'গরিবি হটাও' স্লোগান তুলেছিলেন কংগ্রেস নেত্রী, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি। নানা প্রকল্পও ঘোষণা করেছিলেন, তবু গরিবি হটেনি। দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। দারিদ্র, বেকারি ও মূল্যবৃদ্ধির যন্ত্রণায় ছটফট করা মানুষ শেষ পর্যন্ত ক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। প্রথম দিকে প্রশাসনিক দমন-পীড়ন ও তারপর দেশে 'জরুরি অবস্থা' জারি করে মিলিটারি নামিয়ে বন্দুকের জোরে দেশব্যাপী সেই বিক্ষোভ থামাতে হয়েছিল ইন্দিরা গান্ধিকে। এর ফলে অবশ্য কংগ্রেসকে পরাজয়ের মালা পরতে হয়েছিল। তারপর এসেছে জনতা সরকার, বিজেপি সরকার, ভিপি সিং সরকার, সিপিএম সমর্থিত দেবেগৌড়া সরকার ও গুজরাল সরকার। এই সরকারগুলি স্বল্পস্থায়ী হলেও দেশবাসীর দারিদ্র মোচনের প্রতিশ্রুতি শোনাতে কেউ কম যায়নি। এসব কথায় চিঁড়ে ভেজে না। তাই বর্তমানের কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার একেবারে দিনক্ষণ ঘোষণা করে দিয়েছে। আগামী ২০২০ বা বড়জোর ২০২২ সাল। তার মধ্যেই দেশের সব গরিবি খতম।

কী করে?

পশ্চিমবঙ্গের পূর্বতন সিপিএম সরকার এ রাজ্যে বেকার সংখ্যা কমাতে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করেই অভিনব কায়দা অবলম্বন করেছিল। তারা কম্পিউটারের পর্দায় বহু নাম স্রেফ 'ডিলিট করে' অর্থাৎ ছেঁটে দিয়েছিল। নিঃসন্দেহে দুর্দান্ত কৌশল! অবশ্যই ধূর্ত কৌশল। কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারও দেশে দরিদ্রের সংখ্যা কমাতে গত কয়েক বছর যাবৎ অভিনব ব্যবস্থা নিচ্ছে। কাদের গরিব বলা হবে — শুধু সেই ব্যাখ্যাটাই বদলে দিচ্ছে এবং তাতেই কেল্লা ফতে। যদি দেশের মানুষের খাওয়া-পরা-বাসস্থান-চিকিৎসা-শিক্ষার ন্যূনতম প্রয়োজনটাকে দারিদ্রের সীমারেখা হিসাবে ধরা হয় তবে দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ দরিদ্র হিসাবে বিবেচিত হবে। কিন্তু যদি বলে দেওয়া হয়, দেশে যার দৈনিক আয় ১০ টাকা বা তার নিচে, সেই-ই গরিব, তাহলে সেই বিচারে দেশে গরিব কেউ থাকবে না। সত্যিই, নোবেল প্রাইজ পাওয়ার মতো মাথা!

ছয়ের পাতায় দেখুন

দলতন্ত্র ঃ শিক্ষামন্ত্রীকে তরুণ নস্করের চিঠি

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী শ্রী ব্রাত্য বসু গত ৯ মে একটি অনুষ্ঠানে শিক্ষায় রাজনৈতিক দলের কায়েমী স্বার্থ দূর করা বিষয়ে কিছু অভিমত ব্যক্ত করেন। সেই প্রসঙ্গে অধ্যাপক তরুণ নস্কর গত ১০ মে, নিম্নের চিঠিটি পাঠিয়েছেন উচ্চশিক্ষামন্ত্রীকে।)

"কলেজগুলি থেকে 'দলের কায়েমী স্বার্থকে দূরে সরিয়ে' রাখার উদ্দেশ্যে আপনি যে পদক্ষেপের কথা গত ৯ মে ঘোষণা করেছেন সে সম্পর্কে আমি কয়েকটি বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

(১) গত ৩৪ বছরে সিপিএম পরিচালিত সরকার যেভাবে শিক্ষার সর্বক্ষেত্রে নগ্নভাবে দলীয় অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিল তা বন্ধ করার কথা বর্তমান সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে যখন ঘোষণা করেছিল তখন সকল স্তরের শিক্ষানুরাগী মানুষের মধ্যে একটি প্রত্যাশার সৃষ্টি হয়েছিল।

(২) প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে গত ডিসেম্বরে রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আইন সংশোধনের জন্য যে বিল আনা হয়েছিল তাতে কিছু ইতিবাচক দিক থাকলেও শিক্ষক-ছাত্র থেকে শুরু করে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত নানা অংশের নির্বাচনভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের ধারাগুলি যেভাবে সংশোধন করা হয়েছিল, তাতে শিক্ষায় আমলাতান্ত্রিকতা যে বৃদ্ধি পাবে ও সরকার তথা শাসক দলের অনুপ্রবেশের যে প্রভূত সুযোগ থাকবে তা অনেকেরই মনে হয়েছিল।

সাতের পাতায় দেখুন

কার্শিয়াঙে টিবি স্যানাটোরিয়াম ব্যবসায়ীদের হাতে দেওয়ার প্রতিবাদ

দার্জিলিং-এর মানুষের জন্য একটি দুঃসংবাদ। জেলার কার্শিয়াঙের শশীভূষণ দে টি বি স্যানাটোরিয়ামটি পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পি পি পি)-এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য ব্যবসায়ীর হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বর্তমান রাজ্য সরকার। এর ফলে পশ্চাদপদ পাহাড়ি এলাকার মানুষ চিকিৎসা করাতে গিয়ে আরও অর্থনৈতিক সংকটের সামনে পড়বেন। এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ সজল সরকার জানান, ১৯৩৪ সালে প্রয়াত শশীভূষণ দে-র অনুদানে ৩২ একর জমিতে এই স্যানাটোরিয়ামটি গড়ে ওঠে। দেশে যেখানে মাল্টি ড্রাগ রেজিস্টান্ট টি বি ক্রমবর্ধমান এবং টি বি রোগেই দেশের সর্বাধিক মানুষের মৃত্যু ঘটে, সেখানে এই হাসপাতালটির প্রয়োজন অপরিসীম। প্রসঙ্গত তিনি বলেন, যাদবপুর কে এস রায় টি বি হাসপাতাল-কেও বেসরকারি হাতে তুলে দিয়েছে পূর্বতন সিপিএম সরকার। ঢাকুরিয়ার সরকারি নিরাময় পলিক্লিনিককে পি পি পি মডেলে স্বাস্থ্য ব্যবসায়ীর হাতে তুলে দেওয়ার পর নাম পাল্টে আমরি হাসপাতাল হয়েছে। তার মর্মান্তিক পরিণতি আজ সকলে জানেন। এই সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, পার্বত্য এলাকার মানুষের স্বার্থে কার্শিয়াঙে টি বি রোগের উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা ও পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন শিক্ষা ব্যবস্থা সহ সরকারি মেডিকেল কলেজই স্থাপন করতে হবে, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নয়।

বন্দিমুক্তির দাবিতে আন্দোলন চাই সম্মেলনে ঘোষণা

সমস্ত রাজনৈতিক বন্দির নিঃশর্ত মুক্তি, জঙ্গলমহল থেকে যৌথবাহিনী প্রত্যাহার, ইউ এ পি এ-আফস্পা-এন সি টি সি সহ সমস্ত কালাকানুন বাতিল করা প্রভৃতি দাবিতে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে বন্দিমুক্তি কমিটির তৃতীয় রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ২৭-২৮ এপ্রিল। ২৭ এপ্রিল প্রতিনিধি অধিবেশন হয় কলকাতার স্টুডেন্টস হলে। এই সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিনিধিরা যোগদান করেন। অধ্যাপক মানস জোয়ারদার, সদানন্দ বাগল ও সুখেন্দু ভট্টাচার্যকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী প্রতিনিধি অধিবেশন পরিচালনা করেন। সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে মহাশ্বেতা দেবীর পাঠানো শুভেচ্ছাবার্তা সভায় পাঠ করা হয়। সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে বিশেষ অতিথি এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর বিধায়ক অধ্যাপক তরুণ নস্কর বলেন, বন্দিমুক্তি আন্দোলনের এক সুবিশাল ঐতিহ্য আছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর সময়ে বন্দিমুক্তি আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। সমাজের সুস্থিতি এবং মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে মর্যাদা দিতে বিগত সরকারের আমলে গ্রেপ্তার হওয়া বন্দিদের যদি নবগঠিত সরকার মুক্তি দিতে চায়, তা তারা দিতে পারে। সুপ্রিম কোর্টের রায়েই এ কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা আছে। বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণার আগে জঙ্গলমহলে এক জনসভায় বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, সরকারে এসেই রাজবন্দিদের তারা মুক্তি দেবেন। কয়েকটি নির্বাচনী সভায় প্রবোধ পুরকাইত-এর নাম করে তিনি তাঁর মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু নতুন সরকারের এগারো মাসেও সেই প্রতিশ্রুতি পালিত হয়নি। তবুও তিনি আশা ব্যক্ত করেন যে, সরকার প্রতিশ্রুতি পালন করবে। সংগঠনের সম্পাদক ছোটন দাস তাঁর প্রতিবেদন পেশ করেন এবং প্রতিনিধিরা প্রতিবেদনের উপর তাঁদের বক্তব্য রাখেন।

সংগঠনের অন্যতম সহ সভাপতি সদানন্দ বাগল সকল মানবাধিকার সংগঠনগুলির উদ্যোগে যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। মানবাধিকার আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সুজাত ভদ্র বলেন, সরকার নানা টেকনিক্যাল বিষয় তুলে রাজনৈতিক বন্দি কাকে বলা হবে তা নির্ধারণে নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। ফলস্বরূপ রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার এস ইউ সি আই (সি)-এর নেতা প্রবোধ পুরকাইত সহ বহু বন্দির এখনও মুক্তি হল না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, তিনি মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন এ রাজ্যে ইউ এ পি এ প্রয়োগ হবে না। তাঁর সেই প্রতিশ্রুতিও তিনি রাখেননি। এই সম্মেলনে সি পি ডি আর এস-এর সভাপতি ডাঃ সুভাষ দাশগুপ্ত, এ পি ডি আর-এর সহসভাপতি সনৎ কর এবং মানবাধিকার আন্দোলনের প্রবীণ নেতা মন্মথ ঘোষও বক্তব্য রাখেন।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশনে বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। সম্মেলন থেকে মহাশ্বেতা দেবীকে সভাপতি ও ছোটন দাসকে সাধারণ সম্পাদক করে সংগঠনের রাজ্য কমিটি গঠিত হয়।

২৮ এপ্রিল কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশে সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে বক্তাদের মধ্যে ছিলেন প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়, সুজাত ভদ্র, সন্তোষ রাণা, নব নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক ছোটন দাস এবং এস ইউ সি আই (সি) সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল।

নদিয়ায় পরিচারিকার অস্বাভাবিক মৃত্যুর প্রতিবাদ

১৩ এপ্রিল নদীয়ার নবদ্বীপের ভকত পাড়ার বাসিন্দা পুলিশ কর্মী বারীন্দ্র বোসের বাড়িতে তার সর্বক্ষণের গৃহ পরিচারিকা অনুপ্রিয়া বিশ্বাস (২২) খুন হন। তাকে ধর্ষণ করে পুড়িয়ে মেরে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়। সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির নদিয়া জেলা সম্পাদিকা অপর্ণা গুহ ও অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের সদস্যা লক্ষ্মী চৌধুরী দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যান। তাঁদের নেতৃত্বে এলাকার পরিচারিকা মা-বোন সহ দুই শতাধিক মহিলা নবদ্বীপ থানায় বিক্ষোভ দেখান। দাবি জানান অপরাধীদের গ্রেপ্তার করতে হবে, শাস্তি দিতে হবে। দোষীরা গ্রেপ্তার না হওয়ায় ৭ মে বেলা বারোটা থেকে পরিচারিকা সমিতির নেতৃত্বে মায়াপুর মোড়ে সহস্রাধিক পরিচারিকা মা-বোন সহ এলাকার মানুষ পথ অবরোধ করেন। জয়েন্ট বি ডি ও দ্রুত পদক্ষেপ নেবেন বলে জানান।

মেদিনীপুরে উচ্ছেদের প্রতিবাদে আন্দোলন

৬ নম্বর জাতীয় সড়ক ছয় লেনে সম্প্রসারণের পরিপ্রেক্ষিতে দুই মেদিনীপুর জেলার সহস্রাধিক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও দোকানদার উচ্ছেদের আশঙ্কায় দিন গুনছেন। সম্প্রতি জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ (এন এইচ এ আই) মাইক প্রচার করে ১৯ এপ্রিলের মধ্যে দোকান ভেঙে দেওয়ার কথা ঘোষণা করলে ক্ষতিগ্রস্তরা পুনর্বাসনের দাবিতে 'মেদিনীপুর ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও দোকানদার পুনর্বাসন সংগ্রাম সমিতি' গঠন করে আন্দোলনে নেমেছেন। গত ১৬ এপ্রিল কলকাতায় এন এইচ এ আই-এর প্রোজেক্ট ম্যানেজারের নিকট স্মারকলিপি পেশ করা হয়। ১৯ এপ্রিল রাস্তা সম্প্রসারণের কাজে নিযুক্ত ঠিকাদার সংস্থার পাঁশকুড়া অফিসে প্রায় তিন শতাধিক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও দোকানদার বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং উলুবেড়িয়ায় প্রধান ঠিকাদার অশোক বিল্ডকন লিমিটেডের আধিকারিকের কাছে স্মারকলিপি দেন। ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন, গুরুত্বপূর্ণ জংশনগুলিতে ওভারব্রিজ, আন্ডারপাস, সাবওয়ে নির্মাণ, সমস্ত বাসস্টপে যাত্রী প্রতীক্ষালয় ও শৌচাগার নির্মাণ, অধিগৃহীত জমির মালিকদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের দাবি করা হয়। উপরোক্ত কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন সমিতির যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিত সাঁতরা, রতন চন্দ্র দে, সভাপতি সুকুমার খাটুয়া, মুখপাত্র নারায়ণ চন্দ্র নায়ক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। ২৪ এপ্রিল দোকানদারদের এক সভায় এই আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সারা বাংলা কৃষিজমি ও বাস্তু, জীবন-জীবিকা রক্ষা কমিটির সম্পাদক অধ্যাপক মানস জানা। ঐ সভা থেকে আগামী ১০ মে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাশাসক এবং ১১ মে পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ ডেপুটেশনের কর্মসূচি ঘোষিত হয়।

পাবলিক রিলিফ সোসাইটির উদ্যোগে স্বাস্থ্যশিবির

৫ মে পাবলিক রিলিফ সোসাইটির পরিচালনায় গরিব দুঃস্থ বস্তিবাসীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ শিবির আয়োজিত হয় টালা নজরুল পল্লিতে। এই স্বাস্থ্যশিবির উদ্বোধন করেন পাবলিক রিলিফ সোসাইটির পশ্চিমবঙ্গ কমিটির আহ্বায়ক শুক্লা দে চৌধুরী। তিনি বলেন, রাজ্য জুড়ে আরও অসংখ্য এই ধরনের ক্যাম্প পরিচালনা করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন সর্বস্তরের মানুষের সাহায্য ও সহযোগিতা। ক্যাম্পে ১৩২ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে ওষুধ দেওয়া হয়। শিবির পরিচালনায় টালা নজরুল পল্লিবাসীরা সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেন।

উত্তরবঙ্গে বিধ্বংসী ঝড়ে দুর্গতদের ক্ষতিপূরণের দাবি

৩ মে রাতে উত্তরবঙ্গে বিস্তীর্ণ এলাকায় বিধ্বংসী কালবৈশাখী ঝড় ও শিলাবৃষ্টির ফলে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়। অসংখ্য বাড়ি ঘর ভেঙে যায়, জমির ফসল নষ্ট হয়। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৯০ কোটি টাকার উপরে। ত্রাণের কাজে সরকারি অবহেলার প্রতিবাদে দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি লাগোয়া ফুলবাড়ি, জটিয়াকালি সহ রাজগঞ্জ ব্লকের বিভিন্ন এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে সংগঠিত করে এস ইউ সি আই (সি) ফুলবাড়ি লোকাল কমিটি ও রাজগঞ্জ লোকাল কমিটির যৌথ উদ্যোগে ১০ মে রাজগঞ্জ বিডিও দপ্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয় ও প্রতিনিধি দল স্মারকলিপি দেয়। অবিলম্বে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ, ক্ষতিপূরণ ও ত্রাণবণ্টনে দলবাজি বন্ধ করা, বোরো ধান ও পাটচাষিদের ফসলের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানানো হয়। প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে কমরেডস আবুল কাশেম, মোজাম্মেল হক, উদয় রায় প্রমুখ।

বিডিও অফিসের সামনে অনুষ্ঠিত এক বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন কমরেডস মানিউল ইসলাম, তীরেশ রায়, জয়ন্ত ঘোষ, আবুল কাশেম প্রমুখ।

নামখানায় মোটরভ্যান চালকদের বিক্ষোভ অবস্থান

সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের নামখানা ব্লক শাখার উদ্যোগে ২৭ এপ্রিল নামখানা বিডিও অফিসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। এই বিক্ষোভ ঠেকাতে ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল ও নামখানা থানার পুলিশ সমগ্র বিডিও অফিস প্রায় ঘিরে রেখেছিল। ১০ মাইল, ৮ মাইল, ৭ মাইল, শাসমল বাঁধ, চন্দ্রনগর, লালপুর প্রভৃতি এলাকার শতাধিক মোটরভ্যান মিছিল করে নামখানা ফেরিঘাট ঘুরে বিক্ষোভস্থলে উপস্থিত হয়। মোটরভ্যান চালকদের লাইসেন্স দেওয়া, পরিবহন কর্মী হিসাবে স্বীকৃতি, সামাজিক সুরক্ষা আইনের আওতায় আনা ও মোটরভ্যান চালকদের উপর পুলিশি হেনস্থার প্রতিবাদে এই বিক্ষোভ অবস্থান হয়। এক প্রতিনিধিদল বিডিও-র সঙ্গে দেখা করে। ইউনিয়নের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সভাপতি গৌরহরি মিস্ত্রির নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলে ছিলেন কমলেন্দু পাণি, সমর বেরা, শ্রীকৃষ্ণ করণ, সেখ ফরিদ, লক্ষণ নায়েক, নিবারণ মণ্ডল।

বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন স্বপন রায়, সেখ মোস্তাফা, চিত্ত জানা প্রমুখ। বিডিও দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন।

সমাজতন্ত্রের সাফল্য কি মিথ্যা প্রচার?

আমেরিকার 'অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট' আন্দোলন তখন তুঙ্গে। ইউরোপের দেশে দেশে গণবিক্ষোভের ঢেউ। কিছুকাল আগেই মিশরের যুবশক্তির দৃঢ়পণ লড়াই গোটা দুনিয়াকে বিস্মিত করেছে. স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদের মধ্যস্থলে বিশাল জমায়েত থেকে 'পরিবর্তনের' আওয়াজ গোটা ইউরোপে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। চিলির বিক্ষোভে পুলিশি অত্যাচার, নিউইয়র্কের রাস্তায় যুবতীকে ফেলে পুলিশের লাঠি তখন প্রতিদিনকার ছবি। তারপর অবস্থার বদল কিছুই হয়নি। মনে পড়ে সেই সময় স্পেনের এক যুবকের কিছু কথা ভেসে এসেছিল আমাদের এই ভারতেও। সে বলেছিল, 'আমরা এই অবস্থার পরিবর্তন চাই। আমার ঘরে মা-ভাই-বোন আছে, কিন্তু আমি বেরিয়ে এসেছি, রোজ মিছিল-বিক্ষোভে যোগ দিচ্ছি আরও অনেকের সাথে। একদল আমাদের বলে, এই অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে না, পুঁজিবাদী শোষণ-বঞ্চনাই শেষ কথা, আমাদের এর থেকে মুক্তি নেই। আমি একথা বিশ্বাস করি না। আমি মনে করি, অবশ্যই এই অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব, আমরাই সেটা পারি, সেজন্য আমি বিপ্লব চাই।' কিন্তু কী সেই বিপ্লব, তার কোনও ধারণা ঐ যুবকের কথায় পাওয়া যায়নি। একই সময় ওয়াল স্ট্রিটের জনতা আওয়াজ তুলেছে, কলকারখানা-ব্যাঙ্কের মালিকরা জনসংখ্যার মাত্র ১ শতাংশ, কিন্তু রাষ্ট্রব্যবস্থা ওদেরই স্বার্থ দেখে, আমরা জনসংখ্যার ৯৯ শতাংশ, আমাদের কথা এই ব্যবস্থা ভাবে না।

অনেকেই ভেবেছেন, এই স্লোগান শুনতে ভালো, কিন্তু কাল্পনিক। সত্যই কি এরকম একটা রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্ভব, যা ১ শতাংশের নয়, ৯৯ শতাংশ জনগণের স্বার্থে কাজ করতে পারে? হ্যাঁ, সম্ভব এবং তেমন ব্যবস্থা এই বিশ্বেই প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের পর প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েট ইউনিয়নে। সেটা ছিল সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। একথা শুনলেই এখন পুঁজিবাদের চিহ্নিত দালালরা বলবে, 'ওসব মিথ্যা প্রচার'। আর একদল অবিশ্বাসী সংশয়ে মাথা নাড়বে। কিন্তু সেই ইতিহাস বহু যুগ আগের নয় যে তার তথ্য প্রমাণ সব হারিয়ে গেছে বা যে ভূখণ্ডে তা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছিল, তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। না, সোভিয়েট ইউনিয়ন নামক ভূখন্ড দাঁড়িয়ে আছে আগের মতোই, যদিও তার আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থা বদলে যাওয়ায় তা এখন আর বহু জাতি নিয়ে গঠিত একটি অখন্ড যুক্তরাষ্ট্র হিসাবে নেই, বহু রাষ্ট্রে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে পুঁজিবাদ ফিরে আসায় রাশিয়াসহ সমগ্র ভূখণ্ডের জনজীবনে বেকারি-দারিদ্র, হাহাকার, অনাচার ফিরে এসেছে। আর তথ্য প্রমাণ? তাকে ধ্বংস ও বিকৃত করার হাজার ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও তা রয়েছে শুধু নয়, নতুন নতুন গবেষণা অতীতের বহু সাম্রাজ্যবাদী মিথ্যা প্রচারের জাল ছিঁড়ে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন করছে।

১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করার পর লেনিন হাতে পেলেন একটা সংকটগ্রস্ত যুদ্ধবিধ্বস্ত, দুর্ভিক্ষ জর্জরিত রাশিয়া। সেই অবস্থাই পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীরা উঠে পড়ে লাগে ভাতে মেরে রাশিয়ার জনগণকে শিক্ষা দিতে। রুশ জনগণের একমাত্র অপরাধ তাঁরা জারের বদলে তাঁদের পছন্দমতো একটি শক্তি ও রাজনৈতিক দলের ওপর নির্ভর করেছেন। জারতন্ত্রকে তাঁরা ফিরিয়ে আনবেন না এই তাঁদের পণ।

প্রাক্ বিপ্লব রাশিয়ার অবস্থাটা কী ছিল তার একটা আন্দাজ মিলতে পারে পুদভকিনের দি এন্ড অব সেন্ট পিটার্সবার্গ সিনেমার গোড়ার একটা দৃশ্য থেকে। এক অকালবৃদ্ধ চাষির ঘরে নাতনি জন্মেছে। সুখবরটা পেয়েই শতছিন্ন পোশাক ও ঠাণ্ডা আটকাতে পায়ে চটবাঁধা চাষির প্রতিক্রিয়া, 'আবার একটা বাড়তি মুখে খাদ্য জোটাতে হবে।' 'সবহারাদের সংখ্যায় একটা যোগ হল, খাবার জোটাতে এবার কাজের সন্ধানে গ্রাম ছেড়ে শহরে যেতে হবে।' জারের আমলে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় রুশ চাষি পায়ে খড় বা চট বেঁধে চলতে বাধ্য হত। জুতো তাদের জুটত না। সারা দেশে বছরে চামড়ার জুতো তৈরি হত মাত্র ২ কোটি, যা ধনী এবং অভিজাতদের ভোগেই লাগত। বিপ্লবের পর প্রত্যেক নাগরিকের জন্য একজোড়া জুতো তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়। এর অর্থ হল এক ধাক্কায় জুতো উৎপাদন ২ কোটি থেকে বাড়িয়ে ১৭ কোটিতে নিয়ে যাওয়া।

প্রাকবিপ্লব রাশিয়া ছিল শিল্পে পশ্চাদপদ, প্রধানত কৃষিভিত্তিক দেশ। তার রপ্তানি বাণিজ্যের অর্ধেকের বেশি ছিল কৃষিপণ্য। বিপ্লবের পরে গোটা পুঁজিবাদী দুনিয়া রাশিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। আমেরিকা সোভিয়েট সরকারকে স্বীকৃতি দেয়নি। ব্রিটিশ সরকারও দেয়নি, অথচ ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর বুর্জোয়া কেরেনস্কি সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল ব্রিটিশ সরকার। ১৯৫১ সালে ভারতের প্রখ্যাত সাংবাদিক সত্যেন্দ্র নাথ মজুমদার গিয়েছিলেন রাশিয়ায়। 'আমার দেখা রাশিয়া' বইতে তিনি লিখেছেন, ''১৯১৭-এর মহান অক্টোবর বিপ্লব, লেনিন-স্তালিন চালিত বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবার দুর্বার সঙ্কল্প বিশ্ব-ইতিহাসের এক বৃহৎ পটপরিবর্তন। প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মান আক্রমণে দেশ ক্ষতবিক্ষত। বিপ্লবের পর বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির দ্বারা আবার আক্রমণ ও প্রতিবিপ্লবীদের কৃতঘ্ন আঘাত অতিক্রম করে শিশু-সোভিয়েত নিজের পায়ে ভর করে দাঁড়াল, প্রতি পাঁচ বছরে এক এক শতাব্দী এগিয়ে যাবে, এই তার পণ। দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র, অশিক্ষা, বহু কালের দাসত্ব ও শোষণে পঙ্গু মানুষের জড়বুদ্ধি, এই দুস্তর বাধা অতিক্রম করে সকল রকম শোষক শ্রেণির উচ্ছেদ করল। গড়ে উঠল এক ঐক্যবদ্ধ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যেখানে সর্বসাধারণের অভিপ্রায় ও উদ্যম কেন্দ্রীভূত হয়ে অসাধ্য সাধন সম্ভব করল।''

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে একদিকে ছিল ব্রিটেন-ফ্রান্স ও রাশিয়ার ত্রিশক্তি আঁতাত; অন্যদিকে জার্মানি, অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান রাজতন্ত্র ও ইতালি। জারতন্ত্র তার সাম্রাজ্য বিস্তারকল্পে যুদ্ধে জড়িত হওয়ায় সাধারণ মানুষের জীবনে নেমে আসে অন্ধকার। বিশাল সৈন্যবাহিনী পুষতে দেশের অর্থনীতি রক্তশূন্য হয়ে পড়ে। বিপুল সংখ্যক কর্মক্ষম মানুষকে চাষবাস ছেড়ে যুদ্ধে পাঠানো হয়, ফলে কৃষি উৎপাদন ৪৭ শতাংশ কমে যায়। যেটুকু শিল্প গড়ে উঠেছিল, তাও যুদ্ধের কাজে লাগানো হল। যুদ্ধের প্রয়োজনে কারখানাগুলিতে শ্রমিকদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় বাড়তি শ্রমের বিপুল বোঝা, যার প্রতিবাদে সর্বত্র শুরু হয় শ্রমিক ধর্মঘট। রাশিয়ার কৃষিসম্পদ যুদ্ধের কাজে ব্যয় হতে লাগল, ফলে খাদ্যে টান পড়ে। দলে দলে রিফিউজি এখানে ওখানে ছুটে বেড়াতে থাকে। যুদ্ধ চলাকালে রাশিয়ার অর্থনীতি বেশি করে ব্রিটিশ ও ফরাসি পুঁজির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ৩০০ কোটি রুবল ধার দেওয়ার শর্ত হিসাবে ব্রিটিশ সরকার জারের কাছে রাশিয়ার স্বর্ণভাণ্ডারের একটা অংশ জামানত হিসাবে দাবি করে। ফরাসি সরকার তথাকথিত সমাজতন্ত্রী আলবার্ত থমাস ও ভিভিয়ানিকে দূত পাঠিয়ে ৪ লক্ষ রুশ সৈন্য ফ্রান্সে পাঠানোর দাবি করে। মানুষের তখন প্রধান দাবি শান্তি চাই, খাদ্য চাই। মানুষকে খেতে না দিয়ে জার সরকার যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণে ৪০০ কোটি রুবল বরাদ্দ করে। জারতন্ত্রের পতনের পর কেরেনস্কি সরকারও যুদ্ধ চালিয়ে যায়। তারাও পরিস্থিতি সামলাতে পারেনি। তার ওপর বৈদেশিক শক্তিগুলি চূড়ান্ত বিজয় না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য কেরেনস্কির ওপর চাপ দিতে থাকে। মানুষকে ঠকাতে কেরেনস্কি বলে, জারতন্ত্র উচ্ছেদের পর যুদ্ধ আর সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ নেই, তা গণতান্ত্রিক রাশিয়াকে বাঁচাবার যুদ্ধে পরিণত হয়েছে। যুদ্ধের খরচ চালাতে তারা ৬০০ কোটি রুবল'লিবার্টি লোন' হিসাবে জনগণের কাছ থেকে তোলার চেষ্টা করে, মেনশেভিক ও সোস্যালিস্ট রেভলিউশনারিরা তা সমর্থন করে, কিন্তু বলশেভিকদের নেতৃত্বে রুশ জনগণ সেই চালাকি ধরে ফেলে। সাম্রাজ্যবাদীরা ঘোষণা করে, জারের আমলের সেনাপতি জেনারেল কর্নিলভ যদি বলশেভিকদের সরিয়ে রাশিয়ায় একটা কড়া ধরনের সরকার কায়েম করতে পারে তবে তারা ৫০০ কোটি রুবল সাহায্য দেবে। কিন্তু বলশেভিকদের কঠোর প্রতিরোধের সামনে কর্নিলভ দাঁড়াতে পারেনি। সাম্রাজ্যবাদীদের উস্কানিতে প্রতিবিপ্লবী জেনারেল কর্নিলভ পোল্যান্ডের রিগা অঞ্চল জার্মান বাহিনীর হাতে তুলে দেয়, যাতে জার্মান বাহিনী সরাসরি পেট্রোগ্রাদে বলশেভিকদের আক্রমণ করতে পারে। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও কেরেনস্কি কর্নিলভকে রক্ষা করতে পারেনি। কর্নিলভের দাবি ছিল রুশ জনগণের শ্রদ্ধেয় নেতা লেনিন হলেন জার্মান গুপ্তচর, অতএব লেনিনের ফাঁসি চাই। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে, একমাত্র বিপ্লবই রাশিয়াকে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদীদের গ্রাস থেকে বাঁচাতে পারে। সেই মুহূর্তে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকরা স্লোগান তোলে, রুটি চাই, শান্তি চাই, আর সে জন্য সোভিয়েটের হাতে সব ক্ষমতা চাই। বলশেভিক স্লোগান মানুষের অন্তরকে নাড়া দিয়ে যায়। ১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বর যুদ্ধবিধ্বস্ত রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র কায়েম হয়। শুরু হয় সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিবিপ্লবীদের নতুন চালাকি, আর লেনিন ও তাঁরই নির্দেশে স্ট্যালিনের নেতৃত্বে বলশেভিকদের অসমসাহসী বিপ্লবী লড়াই।

রাশিয়ার তখন শোচনীয় অবস্থা। ১৯১১ সালে দুর্ভিক্ষ হয়ে গিয়েছে, তাতে তিন কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। শান্তির সময়েও রাশিয়ার বাজার ছিল জার্মানি থেকে আমদানির উপর নির্ভর। শিল্পে বিনিয়োজিত পুঁজির বেশিরভাগই বিদেশি, তার মধ্যে ৩২ শতাংশ ফরাসি ও ২২ শতাংশ ব্রিটিশ। প্রতি বছর বিদেশি পুঁজি যা আসছে তার চেয়ে বাৎসরিক বিদেশি ঋণ বেশি। ১৯১৪ সালে শিল্প ও ব্যাঙ্কপুঁজির মিলিত পরিমাণ ৪৩ কোটি ৫৫ লক্ষ রুবলের মধ্যে ১৮ কোটি ৫৫ লক্ষ রুবল অর্থাৎ, ৪২.৬ শতাংশ বিদেশি। রপ্তানি পণ্য প্রধানত খাদ্যশস্য; আর যন্ত্রপাতি ধাতু ও অন্যান্য খনিজদ্রব্য সবই আমদানি করতে হয়। একশো মানুষ পিছু রাশিয়ার তখন শক্তি ব্যবহার ১.৬ অশ্বশক্তি, অথচ এটাই ছিল জার্মানিতে ১৩, ইংল্যান্ডে ২৪ এবং আমেরিকায় ২৫। পশ্চাদপদ কৃষিতে না আছে যন্ত্র, না আছে সারের ব্যবহার। ১৯১৪ সালের রাশিয়ান ইয়ার বুক অনুযায়ী রাশিয়ায় বছরে এক একর জমিতে সার হিসাবে ফসফরিক অ্যাসিড ব্যবহার হত এক পাউন্ডের ছয় ভাগের একভাগ, যেখানে বেলজিয়ামে ব্যবহার হত ২১ পাউন্ড। কৃষির উৎপাদনশীলতা খুবই কম। জারের আমলে যেটুকু জমি বণ্টন হয়েছিল তাতে চাষি পরিবার পিছু জমির পরিমাণ ৮/৯ একর, তাও এক লপ্তে নয়, টুকরো টুকরো। ১৯১৩ সালের হিসাবে কৃষক পরিবারের গড় বার্ষিক আয় ১৫-১৮ রুবল। খনি ও কারখানায় মজুরি মাসিক ২০-২৫ রুবল যা ব্রিটেনের অর্ধেক। রুটির দাম যুদ্ধের আগে যা ছিল, ১৯১৭ সালের গ্রীষ্মকালে তার তিনগুণ বেড়ে যায়, দুগ্ধজাত পণ্যের দাম পাঁচগুণ ও মাংসের দাম সাতগুণ বাড়ে। তাল দিয়ে বাড়ে শিল্পদ্রব্য ও জ্বালানির দাম। টাকার অঙ্কে মজুরি সামান্য হয়ত বেড়েছিল, কিন্তু মূল্যবৃদ্ধির কাছে তা কিছুই না। ১৯১৮ সালে যখন চোদ্দটি সাম্রাজ্যবাদী দেশ রাশিয়াকে ঘিরে ফেলে বলশেভিকদের ক্ষমতাচ্যুত করতে জারের আমলের প্রতিবিপ্লবীদের মদত দিচ্ছে, তখন একমাত্র জার আমলের যুদ্ধবাজ সেনাপতি দেনিকিনের অগ্রগতির মুখেই দোনেৎস বেসিন থেকে কয়লা আসা বন্ধ হয়ে যায়। বলশেভিক এলাকায় ১৯১৮ সালে ১৩টির বদলে ৯টি ব্লাস্ট ফার্নেস চালু থাকে। ১৯১৯ সালে তা ৫টিতে দাঁড়ায়। কাস্ট আয়রন উৎপাদন ১৯১৮ সালে ছিল ৩৭ লক্ষ পুড যা ১৯২০তে এসে মাত্র ৩ লক্ষ পুডে দাঁড়ায়। খাদ্য, কাঁচামাল ও জ্বালানির অভাবে শিল্পোৎপাদন দারুণভাবে মার খায়।

বিপ্লবের পরও এই ছিল রাশিয়ার অবস্থা। এর ১২ বছর পর ১৯৩২ সালে সোভিয়েট ভ্রমণে যান জার পরিবারের সন্তান ইরিনা স্কারিয়াতিনা। তিনি লিখেছেন ''১৯১৩ সালে শিশুমৃত্যুর হার ছিল হাজারে দু'শো সত্তর, ১৯২৬ সালে তা কমে হয়েছে এক'শো চুয়াত্তরে। একই সময়ে বয়স্ক মানুষের মৃত্যুহার হাজারে আঠাশের জায়গায় হয়েছে বাইশ।... গত চার বছরে ৫ কোটি ৮০ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ পড়তে লিখতে শিখেছে। ১৯১৩ সালে রাশিয়ায় নিরক্ষরের সংখ্যা ছিল ৬৮ শতাংশ, ১৯৩২ সালে তা কমে হয় মাত্র ৯ শতাংশ। ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া গিয়ে অভিভূত হয়েছিলেন। ওদের সাধনা দেখে তিনি লিখেছেন ''এরা জেনেছে অশক্তকে শক্তি দেবার একটিমাত্র উপায় শিক্ষা— অন্ন স্বাস্থ্য শান্তি সমস্তই এরই 'পরে নির্ভর করে। ফাঁকা 'ল অ্যান্ড অর্ডার' দিয়ে না ভরে পেট, না ভরে মন। অথচ তার দাম দিতে গিয়ে সর্বস্ব বিকিয়ে গেল।'' ''যখন শুনেছিলুম এখানকার চাষি ও কর্মীদের মধ্যে শিক্ষা হু হু করে এগিয়ে চলেছে আমি ভেবেছিলুম, সে শিক্ষা বুঝি সামান্য একটুখানি পড়া ও লেখা ও অঙ্ক কষা — কেবলমাত্র মাথা গুণতিতেই তার গৌরব। সেও কম কথা নয়। কিন্তু এখানে দেখলুম, বেশ পাকা রকমের শিক্ষা, মানুষ করে তোলবার উপযুক্ত।'' ইরিনা স্কারিয়াতিনা লিখেছেন ''১৯১৪ সালের পর দুর্দশাপীড়িত মস্কো নার্ভা জেলায় কেমন পরিবর্তন হয়েছে, দেখার খুব ইচ্ছা ছিল, দেখলাম বীভৎস পুরনো বস্তিগুলি ভেঙে আলো-বাতাস পূর্ণ আধুনিক অ্যাপার্টমেন্ট হয়েছে।'' তিনি দেখেছিলেন ভয়ঙ্কর জেলগুলিও আগের মতো নেই। সেখানে বন্দিরা কাজ করে মাইনে পায়। কারাগার থেকে বের হওয়ার পরও তাদের গায়ে দাগী অপরাধীর ছাপ মেরে দেওয়া হয় না। তারা সুস্থ জীবন যাপন করতে পারে। যেজেলে বিপ্লবী চিন্তাশীল স্বপ্নদর্শী মানুষদের যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করা হত তাকে সংগ্রহশালা করে রাখা হয়েছে। ১৯১৭ থেকে

পাঁচের পাতায় দেখুন

কেন আমরা ২৪শে এপ্রিল উদযাপন করি

কেরালার সভায় কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী

পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন উপলক্ষে ২৪শে এপ্রিল কেরালা রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে ত্রিশূর জেলার কোডানগাল্লুরে মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের সমস্ত জেলা থেকে কর্মী-সমর্থকরা এতে অংশ নেন। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড সি কে লুকোস। বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড ভি বেনুগোপাল এবং ত্রিশূর জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড পি এস বাবু। প্রধান বক্তা ছিলেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী।

কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী বলেন, দলের অনেক সমর্থক প্রশ্ন করেন, আমরা দলের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করি কেন, অন্য দলগুলি তো করে না! অন্য দলগুলি কেন করে না, তার জবাব তাঁরা দেবেন, তবে আমরা ঐতিহাসিক কারণেই প্রতি বছর ২৪শে এপ্রিল দিনটি উদযাপন করি। বিশ্বের যে কোনও দেশে বিপ্লব সংঘটিত হলেই, বিশেষ করে তা যদি হয় সর্বহারা বিপ্লব, আমরা নানা কারণে সেই দিবস উদযাপন করি। রাশিয়ার নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী পালনের কথাই ধরুন। তা থেকে প্রেরণা নিয়ে আমাদের দেশে বিপ্লব গড়ে তোলা, তা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের দেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে তা প্রয়োগ করা, জনগণকে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করা ইত্যাদি নানা কারণে নভেম্বর বিপ্লব দিবস আমরা উদযাপন করি।

কিন্তু বিপ্লব তো একদিনে হয় না, এ হল দীর্ঘ ও লাগাতার সংগ্রামের ফল। আবার, বিপ্লব নিজে থেকে হয় না। বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে বিপ্লবের প্রস্তুতি নিতে হয়। লেনিন দেখিয়েছেন, একটি বিপ্লবী পার্টি ছাড়া বিপ্লব হতে পারে না। তিনি বলেছেন, বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া বিপ্লব হয় না। আবার বিপ্লবী পার্টি ছাড়া বিপ্লবী তত্ত্ব আসতে পারে না। এখানেই বিপ্লবী দলের গুরুত্ব।

বিপ্লবী পার্টি হল শ্রমিক শ্রেণির সংগঠন। এই সংগঠন কিন্তু আর পাঁচটা সংগঠনের মতো নয় — এ হল সর্বহারা বিপ্লবীদের দ্বারা গড়ে তোলা বিপ্লবী সংগঠন। সর্বহারা বিপ্লবীদের জন্ম হয় কীভাবে? এরা হল জীবনের সর্বদিক ব্যাপ্ত করে গড়ে তোলা সংগ্রামের ফসল। এ সংগ্রাম সমস্ত অচল প্রাচীন ধ্যানধারণা ও অভ্যাস-আচরণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে জীবন ও সমাজ সহ গোটা বস্তুজগৎ সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার লড়াই। ফলে এ এক নতুন সংস্কৃতি, সর্বহারা বিপ্লবী সংস্কৃতি, অর্থাৎ, পুঁজিবাদী চিন্তাভাবনা ও সংস্কৃতির মূলে রয়েছে যে ব্যক্তিবাদ, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যৌথ দৃষ্টিভঙ্গি ও সংস্কৃতি অর্জন করার লড়াই। একটি সর্বহারা বিপ্লবী পার্টি গড়ে তুলতে গেলেও এই সংগ্রামটাই করতে হয়। আবার মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং সর্বহারা বিপ্লবী সংস্কৃতি ও সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করার লড়াইটাও জীবনের সর্বদিক ব্যাপ্ত করে গড়ে তুলতে হয়।

মহান বিপ্লবী নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের নেতৃত্বে এই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই আমাদের পার্টি গঠিত হয়েছিল। কমরেড ঘোষের নেতৃত্বে কমরেড নীহার মুখার্জী, কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী, কমরেড শচীন ব্যানার্জী, কমরেড প্রীতীশ চন্দ, কমরেড হীরেন সরকার সহ একদল তরুণ বিপ্লবী নিজেদের জীবন এবং গোটা পার্টিকে এই সংগ্রামে নিয়োজিত করেন। এর মধ্য দিয়েই একদল জাত-বিপ্লবীর জন্ম হয়। যৌথ নেতৃত্বের বিশেষীকৃত রূপ প্রকাশিত হয় কমরেড শিবদাস ঘোষের মধ্য দিয়ে। একটি কমিউনিস্ট পার্টির এটাই হল মূলগত সংগ্রাম।

জাত বিপ্লবী হল তারা, বিপ্লবই যাদের জীবন। অর্থোপার্জনের জন্য কোনও পেশায় তারা যায় না, তাদের ধ্যান জ্ঞান সবই বিপ্লব নিয়ে। বিপ্লবের স্বার্থে তারা নিজের প্রাণও বিসর্জন দিতে পারে।

সংগ্রামের এই পথ ধরেই আমাদের মহান পার্টি সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অব ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর উদ্ভব এবং এখানেই অন্যান্য পার্টির সঙ্গে আমাদের পার্টির পার্থক্য। সেইসময় অবিভক্ত সিপিআইকেই সকলে কমিউনিস্ট পার্টি বলে মনে করত। আজ প্রমাণ হয়ে গেছে যে, এই দল আদৌ কমিউনিস্ট দল নয়। সূচনা পর্ব থেকেই সিপিআই ছিল একটা পেটি-বুর্জোয়া পার্টি। নিজেদের মার্কসবাদী বলে দাবি করেও তাঁরা জীবন, সংস্কৃতি সহ সর্বক্ষেত্রেই পুরনো চিন্তাধারা নিয়ে চলতেন। কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার মূলগত সংগ্রামটি তাঁরা করেননি বলেই, হাজার সততা থাকা সত্ত্বেও তাঁদের সংগ্রাম ব্যর্থ হয়ে গেল, তাঁরা কমিউনিস্ট হতে পারলেন না। একজন কমিউনিস্ট হল সম্পূর্ণভাবে পাল্টে যাওয়া মানুষ যে, উচ্চ সংস্কৃতি ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলে এবং জীবন সম্পর্কে নৈর্ব্যক্তিক ধারণার অধিকারী। এটাই হল শ্রমিক শ্রেণির সংস্কৃতি।

ইতিহাসের সমস্ত শোষিত শ্রেণির সঙ্গে তুলনায় শ্রমিক শ্রেণির বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ আলাদা। সামন্ততন্ত্রে ভূমিদাসরা ছিল আরও বেশি অত্যাচারিত, আরও বেশি নিপীড়িত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা সামাজিক মালিকানার দাবিতে কোনও বিপ্লবী পার্টি গঠন করতে পারেনি। এর কারণ হল, যত অত্যাচারিতই হোক, তারা উৎপাদন করত ব্যক্তিগত ভাবে। মার্কস দেখালেন, শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যে শ্রমিক শ্রেণির উদ্ভব ঘটল, সেটি ইতিহাসে সবচেয়ে এগিয়ে থাকা শ্রেণি এবং সবচেয়ে বিপ্লবাত্মক। কারণ, শ্রমিকরা যৌথভাবে গোটা সমাজের জন্য উৎপাদন করে। আপনারা দেখবেন, আজ আধুনিক শিল্পে কোনও একজন মানুষের পক্ষে একা কোনও কিছু উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। হাজার হাজার শ্রমিক এক সাথে এই সব শিল্পে উৎপাদন করে। তারা যৌথভাবে উৎপাদন করে এবং উৎপাদিত পণ্যের কোনও ভাগ নিজেদের ভোগের জন্য নেয় না। তারা সমাজের জন্য উৎপাদন করে, নিজেদের জন্য নয়। এ সত্য একজন শ্রমিক নিজে নাও জানতে পারে, কিন্তু এটাই সত্য। সেই কারণেই মার্কস দেখিয়েছিলেন যে, এই শ্রমিক শ্রেণি, যারা সমাজের জন্য উৎপাদন করে যৌথভাবে, তারা উৎপাদনের উপকরণগুলির উপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং শ্রমিক শ্রেণি ছাড়া অন্য কোনও শ্রেণি এ কাজ করতে পারে না।

মার্কস এবং লেনিন ও শিবদাস ঘোষ সহ সমস্ত মার্কসবাদী চিন্তানায়ক দেখিয়েছেন, একজন কমিউনিস্ট শুধু যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিক হবেন না তাই নয়, তাঁকে ব্যক্তিসম্পত্তিজাত মানসিক জটিলতা থেকেও মুক্ত হতে হবে। এই মানসিক জটিলতা থেকে মুক্ত হওয়ার সংগ্রামের মধ্য দিয়েই একজন মানুষ কমিউনিস্ট হিসাবে গড়ে উঠতে পারে। এটাই হল মহৎ কমিউনিস্ট সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি যা শ্রমিক শ্রেণির কাছে অজানা, তার আধারেই তাদের শিক্ষিত করতে হবে। উৎপাদনে তাদের ইতিহাস নির্ধারিত স্থান সম্পর্কে তাদের সচেতন করতে হবে — সর্বহারার বিপ্লবী পার্টির সেটাই কর্তব্য। শ্রমিক শ্রেণির একটি বিপ্লবী দলের নেতা-কর্মীদের নিজেদের এই সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে তা ছড়িয়ে দিতে হবে প্রাচীন সামন্তী ও পুঁজিবাদী সংস্কৃতি-সম্পন্ন সাধারণ মানুষের মধ্যেও।

ফলে, জনগণের মধ্যে, শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে এই দর্শনগত দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে এবং নিজস্ব শ্রেণিসংস্কৃতি সম্বন্ধে সচেতন করে বিপ্লবের শক্তি হিসাবে তাদের সংগঠিত করতে হবে। মুখে শতবার বিপ্লবের কথা বলা হলেও, এমনকী বিপ্লবের জন্য লড়াইয়ে শতবার প্রাণ দিলেও এই সংগ্রাম ছাড়া কোনও পার্টিই বিপ্লব সংঘটিত করতে পারে না। উদাহরণ হিসাবে নকশাল আন্দোলনের কথা বলা যায়। বহু উজ্জ্বল তরুণ পথভ্রান্ত হয়ে নকশাল আন্দোলনে যোগ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। কিন্তু বিপ্লব আসেনি। বিপ্লব মানে তো আর শুধু অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করা নয়, বিপ্লব হল একটা গুণগত পরিবর্তন। পুরনো সমাজকে ভেঙে নতুন করে গড়া। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও রুচিগত পরিবর্তন নিয়ে এসে নতুন সমাজ সৃষ্টি করা। এই নতুন সমাজ সৃষ্টির সংগ্রামই হল বিপ্লবের জন্য সংগ্রাম।

তিনি বলেন, আমাদের দল একসময় একটি যথার্থ কমিউনিস্ট দল হিসাবে গড়ে উঠেছিল মানে এই নয় যে, বিনা আয়াসেই চিরকাল দলটি তার চরিত্র বজায় রাখতে পারবে। ব্যক্তিবাদী ঝোঁক, ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রতি আকর্ষণ ইত্যাদিতে পূর্ণ পুঁজিবাদী সমাজের যে পঙ্কিল স্রোত আমাদের চারপাশে বয়ে চলেছে, তার বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামকে যদি আমরা আরও উচ্চ স্তরে নিয়ে না যেতে পারি, তাহলে এ পার্টিরও পতন হতে পারে। তাই আমাদের সংগ্রাম আরও শক্তিশালী করতে হবে যাতে নেতা-কর্মীদের মধ্যে সর্বহারা সংস্কৃতি অবিচ্ছিন্ন ধারায় ক্রমাগত উচ্চতর স্তরে পৌঁছায়। এই লক্ষ্যেই আমরা দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করি। এই উদযাপন শুধুমাত্র একটি অনুষ্ঠান নয়, এ হল এক সংগ্রাম। এই দিনটিতে আমরা অন্য কমরেডদের ও নিজেদের আরও একবার স্মরণ করিয়ে দিই যে, এই সংগ্রাম হল পুরনো পচা গলা সংস্কৃতি থেকে আমাদের ধ্যানধারণা, চিন্তাভাবনা, পছন্দ-অপছন্দ ও জীবন সম্পর্কে ধারণাকে মুক্ত করা এবং ব্যক্তিস্বার্থকে শ্রমিক শ্রেণি, পার্টি এবং গোটা সমাজের স্বার্থের সঙ্গে একীকৃত করার সংগ্রাম। শ্রমিকদের শ্রেণিস্বার্থ এবং একজন সর্বহারা বিপ্লবী তথা কমিউনিস্টের স্বার্থের মধ্যে কোনও ব্যবধান থাকা উচিত নয়। এটাই হল, বিপ্লবের স্বার্থের সঙ্গে একজন কমিউনিস্টের স্বার্থের অভিন্নতা বা আইডেন্টিফিকেশন। আরও সুনির্দিষ্ট করে কমরেড শিবদাস ঘোষ যাকে বলেছেন, শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থের সঙ্গে এবং শ্রমিক শ্রেণির পার্টির সঙ্গে একজন কমিউনিস্টের নিজস্ব স্বার্থের অভিন্নতা। পার্টি জীবন ছাড়া একজন সর্বহারা বিপ্লবীর অন্য কোনও জীবন নেই। জনগণের কাছেও সেটা সুস্পষ্ট রূপে আনা দরকার। কমিউনিস্টদের এটা কোনও গোপন আন্দোলন নয়। যদি আমাদের বিচ্যুতি ঘটে, অধঃপতন হয়, জনগণ সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে এবং তার বিরুদ্ধে লড়বে। এ ছাড়া বিপ্লবকে রক্ষা করা যাবে না। এবং একমাত্র এই পথেই পার্টিকেও বিচ্যুতির হাত থেকে বাঁচানো যায়। এই লক্ষ্য থেকেই প্রতি বছর আমরা ২৪শে এপ্রিল দিবসটি উদযাপন করি।

কেরালার মাটিতেও এই সংগ্রাম আমরা শুরু করেছি এখানে পার্টির কাজকর্মের প্রথম দিনটি থেকেই। এই রাজ্যে ১৯৫৭ সালে কংগ্রেসকে পরাস্ত করে সিপিআই ক্ষমতায় আসে। ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে তারা সরকার তৈরি করেছিল। সেই ১৯৫৭ সালে মানুষ ভেবেছিল কমিউনিস্টরা আসছে, মানে বিপ্লবও আসছে। আজ ২০১২ সাল। আপনারা কী দেখছেন? মানুষ দেখছে, বুর্জোয়া পার্টির শাসনের সঙ্গে তথাকথিত এইসব কমিউনিস্টদের শাসনের কোনওই পার্থক্য নেই। তাদের পার্টি বড় হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা ও ত্রিপুরায় ক্ষমতায় বসেছে, অথচ বিপ্লব দূরে হঠেছে। একটি বিপ্লবী পার্টির যখন প্রসার ঘটে, তখন জনতার সচেতনতারও প্রসার ঘটে। মানুষ তখন সংগঠিত হয়, গণসংগ্রামগুলি শক্তিশালী হয়, অথচ এখানে ঘটছে ঠিক উল্টোটা। এর কারণ হল এরা প্রকৃত কমিউনিস্ট নয়। মানুষকে এটা বুঝতে হবে।

কংগ্রেস, বিজেপি-র মতো বুর্জোয়া দলই শুধু নয়, সিপিআই(এম), সিপিআই-এর মতো তথাকথিত বামপন্থী দলগুলিও বিশ্বায়ন, উদারিকরণ ও বেসরকারিকরণ সহ পুঁজিপতিদের স্বার্থবাহী নীতি রূপায়িত করে জনসাধারণের জীবন দুর্বিষহ করে তুলছে। এ সবের বিরুদ্ধে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া জনগণের বাঁচার কোনও পথ নেই। সিপিএম কিংবা সিপিআই কিন্তু গণআন্দোলন গড়ে তুলবে না। কারণ, এই দলগুলি শুধু কমিউনিস্ট নয় তাই নয়, এরাও শোষক পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থই রক্ষা করে চলেছে। মরণোন্মুখ পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থে কাজ করছে বলেই সাংস্কৃতিক ও নৈতিক দিক দিয়ে অধঃপতিত হওয়া ছাড়া এদের উপায় নেই।

মানুষ দেখে, আমাদের পার্টির কর্মীরা আচার-আচরণ ও রুচি-সংস্কৃতির দিক দিয়ে অন্য দলের কর্মীদের থেকে আলাদা। অন্যেরা সকলেই যখন অর্থ ও পদের পিছনে ছুটছে, তখন অসংখ্য উজ্জ্বল ছেলেমেয়ে কেরিয়ারের দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রতিষ্ঠিত এস ইউ সি আই (সি)-র নেতৃত্বে সংগ্রাম করছে।

কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জনের সংগ্রামটি বিপ্লবীদের প্রধান সংগ্রাম। কিন্তু এটাই একমাত্র সংগ্রাম নয়। বিপ্লবীদের আরও একটি সংগ্রাম করতে হয়। সেটি হল জনগণের কাছে যাওয়া, তাদের সঙ্গে থাকা এবং তাদের সংগঠিত করে

ছয়ের পাতায় দেখুন

রোমানিয়ার জনগণ এখন কী বলছে

১৯৮৯-এর ২৫ ডিসেম্বর। সারা দুনিয়ার পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট সংবাদ-মাধ্যমগুলির কী বিজয়োল্লাস! গণতন্ত্রের শত্রু, রোমানিয়ার প্রেসিডেন্ট চেসেস্কুকে ফাঁসি কাঠে ঝোলানো হয়েছে। পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীদের দুনিয়াজোড়া আনন্দোৎসব। গণতন্ত্রের শত্রু মানেই চেসেস্কু, আর চেসেস্কু মানেই কমিউনিস্ট। সে এক বীভৎস প্রচার! কমিউনিস্ট মানেই স্বৈরাচারী, কমিউনিস্ট মানেই গণহত্যাকারী, কমিউনিস্ট মানেই মানবজাতির কলঙ্ক — ইত্যাদি ইত্যাদি। দেখানো হয়েছিল যেন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতনে রোমানিয়ার জনগণ প্রবল খুশি। এখন সেই রোমানিয়ার জনগণ কী বলছে?

সে কথা জানার আগে একটু পিছনে ফেরা যাক। তখন দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গেছে, লেনিন যাকে প্রকৃত অর্থেই 'সাম্রাজ্যবাদীদের আভ্যন্তরীণ ও পারস্পরিক অন্তর্দ্বন্দ্ব' বলে উল্লেখ করেছেন। ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, ইতালি, জাপান, আমেরিকা পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত। উপনিবেশগুলির সম্পদ ও সস্তা শ্রমের উপর নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতে তারা কোনও শত্রুকে টিকে থাকতে দিতে পারে না। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ শেষে বাজারের ভাগ নিয়ে নতুন লড়াই শুরু হল। যার ফল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফলাফলটা একটু ভিন্ন হল। মহাবিক্রমশালী জার্মানি আক্রমণ করল পূর্ব-ইউরোপ ও সোভিয়েত ইউনিয়নকে। হিটলারের দুর্ভাগ্য, সোভিয়েত জনগণের অপূরণীয় ক্ষতি সত্ত্বেও তার বাহিনীকে পর্যুদস্ত হতে হল। অবশেষে পূর্ব ইউরোপের বিরাট অংশ সোভিয়েত লাল ফৌজ দ্বারা ফ্যাসিস্ট শক্তির কবল থেকে মুক্ত হল।

রোমানিয়া ১৯৪০ সাল থেকে ছিল ফ্যাসিস্ট শক্তির অধীন। এই সময়ে ফ্যাসিস্ট শক্তি রোমানিয়ার সোস্যালিস্ট বা কমিউনিস্ট সদস্যদের অধিকাংশকেই বন্দিশিবিরে পাঠায়, নতুবা হত্যা করে। কেউ কেউ সোভিয়েত ইউনিয়নে পালিয়ে গিয়ে প্রাণে বাঁচে। ১৯৪৪ সালে জার্মানির পশ্চাদপসরণে রোমানিয়ার শাসক শ্রেণি অক্ষশক্তি থেকে সরে গিয়ে মিত্র পক্ষে যোগদান করে। সোসাল ডেমোক্র্যাটদের সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে কমিউনিস্টরা জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। যদিও এই ব্যবস্থা ছিল স্বল্পকালীন। ১৯৪৭ সালে পশ্চিমী বুর্জোয়াদের পুতুল রাজা মাইকেলকে বিতাড়ন করা হয়। ব্যাঙ্ক, প্রাকৃতিক সম্পদ, জমি-জায়গা, কল-কারখানা, সব কিছু জাতীয়করণ করা হয়। রোমানিয়ান ওয়ার্কার্স পার্টি যা পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টি নামে অভিহিত হয়, তারা ধনতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনে উদ্যোগী হয়।

খোদ আমেরিকার একটি রিপোর্টে এই সময়কার অগ্রগতি দেখা যাক —

১) ১৯৫০ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত রোমানিয়ায় প্রতি হাজার জনসংখ্যা পিছু হাসপাতালে যে বেড সংখ্যা ছিল এবং হাজার প্রতি যত জন ডাক্তার ছিল, চেসেস্কু জমানায় তা বেড়ে যথাক্রমে দ্বিগুণ ও শতকরা ২৫ ভাগ বেশি হয়। ১৯৫০ থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত শিশু মৃত্যুর হার কমে যায় শতকরা ৭৫ ভাগ।

২) ১৯৪৫ সালে জনসংখ্যার মাত্র ২৭ শতাংশ যেখানে লিখতে ও পড়তে পারত সেখানে ১৯৬৬ সালের মধ্যে শিক্ষিতের হার ১০০ শতাংশে পৌঁছায়।

৩) ১৯৭০ সালের মধ্যে বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখ্যা তিনগুণ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখ্যা ১৯৪৫-এর তুলনায় ২০০০ থেকে বেড়ে ১৩,০০০ হয়।

এই যে সাফল্য, যার পেছনে রয়েছে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, তা কোনওদিনই পুঁজিবাদী সমাজে অর্জন করা সম্ভব নয়। রোমানিয়ার জনগণ যখন পুঁজিবাদী জোয়ালটাকে ঘাড় থেকে নামিয়ে নতুন জীবন গড়ার মানসে, শ্রমজীবী মানুষের প্রয়োজনীয়তা সামনে রেখে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা ঢেলে সাজালেন, তখন একদিকে এল সাধারণ মানুষের মুক্তি, অন্য দিকে প্রকাশ পেল পুঁজিবাদের আসল চেহারা।

ঝানু শোধনবাদী ক্রুশ্চেভের হাত ধরে ৫০-এর দশকের সংশোধনবাদের যে ঝড় বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনকে আঘাত করল, তার হাত থেকে রোমানিয়াও রক্ষা পায়নি। এরপর সোভিয়েত পার্টির নেতৃত্বে গরবাচভরা আসার পর, কালক্রমে সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে হাত মিলিয়ে প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্র শুরু করা হল, তার প্রথম আঘাত পড়েছিল পূর্ব ইউরোপে। একে একে সব সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেরই পতন হয় কার্যত কোনও বাধা ছাড়াই। বাধা আসে রোমানিয়ায়, প্রেসিডেন্ট চেসেস্কু রুখে দাঁড়ান, তাই তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। যথারীতি অত্যাচারী শাসনের নানা গল্প প্রচার হয়। সে দেশের কিছু মানুষও 'গণতন্ত্র' ও 'কল্যাণ'-এর নামে বিভ্রান্ত হয়েছিল। আজ তারা কী বলছে?

দেখা যাক চেসেস্কু পরবর্তী জমানার চেহারা। সামাজিক বণ্টন ব্যবস্থা, কর্মসংস্থান, বাসস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে নেমে এল তীব্র সংকোচন নীতি। রোমানিয়ার ৪৮.৭ শতাংশ মানুষ পড়ল দারিদ্রের কবলে, যা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মধ্যে সর্বোচ্চ। স্বাস্থ্যব্যবস্থা ভেঙে পড়ার দিকে। হাসপাতালগুলিতে ন্যূনতম চাহিদা গজ, ব্যান্ডেজ, অ্যান্টিবায়োটিকও দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ল। অর্থনৈতিক কারণে দেশত্যাগের ফলে দেশের জনসংখ্যা ২০০২-এর তুলনায় বর্তমানে ১২ শতাংশ কমেছে। সরকার শ্রমজীবী মানুষের মজুরি ২৫ শতাংশ সংকোচন করেছে। জীবনযাত্রার মান, সরকারি পরিষেবার সুযোগ সংকোচন করতে করতে সাধারণ মানুষের পিঠ আজ দেওয়ালে ঠেকেছে। শ্রমজীবী মানুষও আজ দুই ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য বুঝে আন্দোলনের পথে। গণআন্দোলন আজ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, প্রধানমন্ত্রী এমিল বোক পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। স্বাস্থ্য পরিষেবা বেসরকারিকরণের প্রচেষ্টা থেকে পিছিয়ে আসতে হয়েছে সরকারকে। যুব সমাজ রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছে। ২০১১ সালে গৃহীত এক সমীক্ষায় প্রকাশ, দেশের অর্ধেক মানুষ মনে করছে, ১৯৮৯ সালের আগে রোমানিয়ার জনগণের জীবনযাত্রা ছিল অধিকতর ভালো। দেশের ৬১ শতাংশ মানুষ মনে করে, কমিউনিজমই হল অধিকতর গ্রহণযোগ্য পথ। দেশের ৭২ শতাংশ মানুষ মনে করে কর্মসংস্থানের দায়িত্ব রাষ্ট্রের, যে দায়িত্ব সমাজতান্ত্রিক সরকার পালন করলেও, বর্তমান সরকার কিছুই পালন করছে না। জনগণের স্পষ্ট অভিমত — বর্তমান রোমানিয়া পশ্চিমী পুঁজিবাদীদের নব উপনিবেশ। দেশ সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে ১৫০ বিলিয়ন ডলার ঋণে নিমজ্জিত। সুতরাং জনগণের উপর এই সংকোচন নীতি তাদেরই চাপিয়ে দেওয়া। তাই জনগণকেই আবার এই শৃঙ্খল মোচনের জন্য লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। জনগণ প্রত্যয়ী যে, শৃঙ্খল মুক্তির রক্তিম সূর্য দিগন্তে উদ্ভাসমান। নিশ্চিতভাবেই তার আবির্ভাব আসন্ন।

এস ইউ সি আই (সি) সমর্থককে হত্যা করল সিপিএম দুষ্কৃতীরা

জয়নগরের বেলে-দুর্গানিগর অঞ্চলের রূপনগর গ্রামের বাসিন্দা এস ইউ সি আই (সি) সমর্থক সওকত খাঁকে ১৪ মে সকালে কুখ্যাত আহাদ গাজির নেতৃত্বে সিপিএম দুষ্কৃতীরা প্রকাশ্যে হত্যা করেছে। এদিন সকালে সওকত খাঁ কলকাতা থেকে ফেরার সময় মায়াহাউড়ি অঞ্চলের দাড়া মোড়ে সিপিএম দুষ্কৃতীরা তাঁকে অটো থেকে নামিয়ে প্রথমে গুলি করে, তারপর চপার দিয়ে আঘাত করে। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। সংবাদ ছড়াতেই শত শত মানুষ ছুটে আসেন, প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। গ্রামবাসীরা বলেন, খুনিদের না ধরা পর্যন্ত তাঁরা মরদেহ পুলিশকে নিতে দেবেন না। এস ডি পি ও ঘটনাস্থলে গিয়ে খুনিদের গ্রেপ্তারের প্রতিশ্রুতি দিলে গ্রামবাসীরা অবরোধ তুলে নেয়।

এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে বলেছেন, সিপিএম পায়ের তলার জমি হারিয়ে আগামী পঞ্চায়েত ভোটে শোচনীয় পরাজয় এড়াতে আবার সন্ত্রাস ও হত্যার আশ্রয় নিচ্ছে। আমরা অবিলম্বে খুনিদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

এই হত্যার প্রতিবাদে ১৫ মে জয়নগর ২ নং ব্লকে ১২ ঘন্টার বনধ, জেলা জুড়ে প্রতিবাদ দিবস ও খুনিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে থানায় থানায় বিক্ষোভ দেখানো হয়।

উত্তরপ্রদেশ ঃ ডি আই জি-র শাস্তি দাবি করল এম এস এস

কোনও মেয়ে নিজের পছন্দমতো বিবাহ করলে তাকে পরিবারের সম্মান রক্ষার্থে হত্যা করার সপক্ষে যেভাবে উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুরের ডি আই জি সতীশকুমার মাথুর সওয়াল করেছেন, তার তীব্র নিন্দা করে অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড এইচ জি জয়লক্ষ্মী ১১ মে এক বিবৃতিতে বলেন, পছন্দ মতো বিবাহের প্রতি পুলিশের বড়কর্তার এই অসহিষ্ণুতা চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক, স্বৈরাচারী এবং অসাংবিধানিক দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচয় দেয়। ডি আই জি-র মতো পুলিশের একজন উচ্চ পদাধিকারীর দায়িত্ব হচ্ছে নাগরিকের জীবন ও সম্মান রক্ষা করা। তা না করে তিনি যেভাবে খোলাখুলি একজন নাগরিককে হত্যার পক্ষেই মত দিয়েছেন, তা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং নিন্দনীয়। এর দ্বারা 'অনার কিলিং'-এর মতো জঘন্য ও নৃশংস কাজকেই উৎসাহ দেওয়া হবে। আমরা মনে করি, এই অফিসারের নিছক বদলি যথেষ্ট শাস্তি নয়, সরকারের উচিত তাঁর আরও কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা।

ওড়িশায় এ আই এম এস এস-এর বিক্ষোভ

ওড়িশার কটকে এক গর্ভবতী মহিলাকে মেরে ফেলার চেষ্টায় অভিযুক্ত তাঁর স্বামী আইনজীবী সত্যব্রত রায় ও শ্বশুর অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সমীর কুমার রায় এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ১১ মে ডি জি-কে তিন দফা দাবি সংবলিত ডেপুটেশন দেয় এ আই এম এস এস।

সমাজতন্ত্র

তিনের পাতার পর

১৯৩২ এই পনেরো বছরে রাশিয়া আমূল বদলে গিয়েছে। ১৯১৩ সালের শিল্পোৎপাদনকে ১০০ ধরলে ১৯৩৭ সালে তার পরিমাণ গোটা পুঁজিবাদী দুনিয়ায় ১৪৯.৪ আর রাশিয়ায় ৮৪০.৮। ১৯১৩ সালে রাশিয়ার মোট জাতীয় আয় ছিল ২১ বিলিয়ন রুবল (১ বিলিয়ন মানে ১০০ কোটি), ১৯৩৮ সালে তা হয়েছে ১০৫ বিলিয়ন রুবল। ১৯২৯ থেকে ১৯৩৬ সালের মধ্যে ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি ও আমেরিকায় শ্রমিকদের বেতনবৃদ্ধি হয়েছে নামমাত্র। সবচেয়ে বেশি বেড়েছে ফ্রান্সে ১০০ থেকে ১১৩, অথচ রাশিয়ায় তা ১০০ থেকে বেড়ে হয়েছে ৩৪৫.৮।

এইভাবে আক্রমণ, অভাব, দারিদ্র থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে মাত্র ২০/২৫ বছরে. মহান নেতা লেনিন ও তাঁর সুযোগ্য ছাত্র স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়ন উন্নয়নে সমগ্র পুঁজিবাদী বিশ্বকে ছাড়িয়ে যায়। সোভিয়েট সমাজতন্ত্র কেবল উৎপাদনবৃদ্ধির জন্যই নয়, নতুন জাতের মানুষ গড়ার জন্য সারা দুনিয়ার বুদ্ধিজীবী চিন্তাশীল মানুষের প্রশংসা অর্জন করে। ১৯২৯ সালে বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী মন্দার আঁচটুকুকেও এড়িয়ে সোভিয়েট সমাজতন্ত্র এগিয়ে যায় ও হিটলারের নাৎসিবাহিনীর কবল থেকে মানবসভ্যতাকে রক্ষা করে সকল গণতান্ত্রিক মানুষের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা অর্জন করে। কাজটা ছিল অত্যন্ত কঠিন তবে তা সম্ভব হয়েছিল প্রধানত দুটি কারণে। প্রথমত সমাজতন্ত্র মুনাফার ভিত্তিতে পরিচালিত না হওয়ায় মুনাফা ও তা থেকে উদ্ভূত অর্থনৈতিক কুফলগুলি সেখানে ছিল না। দ্বিতীয়ত, সোভিয়েট সমাজতন্ত্র পরিচালিত হয়েছিল সর্বহারার মহান নেতা লেনিন এবং তাঁর যোগ্য ছাত্র স্ট্যালিনের সঠিক নীতির দ্বারা, যার অভিমুখ ছিল ধীরে ধীরে পুঁজিবাদের উপাদানগুলির উচ্ছেদ, নতুন জাতের মানুষ তৈরি করা। কমিউনিস্ট নেতা লেনিন ও তাঁর চিন্তাধারার অনুগামী স্ট্যালিন ছিলেন তারই দৃষ্টান্ত। (ক্রমশ)

ভারতে নাকি গরিব থাকবে না

একের পাতার পর

ভুক্তভোগী মানুষ দেখছেন, দিন-মাস-বছর যত যাচ্ছে, ততই বাড়ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম। কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, ছাঁটাই-বেকারি বাড়ছে। হাহাকার বাড়ছে। অনাহারের জ্বালায় ও ঋণের ফাঁদে বন্দি হয়ে আত্মহত্যা বাড়ছে। অনাহার ও অপুষ্টিতে ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যু বাড়ছে। চিকিৎসা করাতে গিয়ে অসংখ্য পরিবার যে দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে, সরকার নিজেই সেই সত্য ঢাকতে পারছে না। অথচ, সরকার শোনাচ্ছে, দেশের প্রভূত উন্নয়ন ঘটছে, গরিব মানুষের সংখ্যা নাকি কমে যাচ্ছে।

কীভাবে হিসাব করছে?

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। যেমন, ২০১০ সালে কেন্দ্রীয় সরকার দারিদ্রের মাপকাঠি হিসাবে রমেশ তেণ্ডুলকর কমিটির সুপারিশ পেশ করেছিল সুপ্রিম কোর্টে। তাতে দেখানো হয়েছিল, শহরাঞ্চলে যাদের দৈনিক আয় ৩২ টাকা বা তার কম এবং গ্রামের ক্ষেত্রে যাদের দৈনিক আয় ২৬ টাকা বা তার কম, তারাই দারিদ্রসীমার নিচে। তা দেখে সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে ভর্ৎসনা করে বলেছিল যে, এই টাকায় কোনও মানুষেরই ন্যূনতম জীবনধারণ সম্ভব নয়। এর পর গত দু-বছরে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের রেকর্ড মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে, ব্যাপক হারে কল-কারখানা বন্ধ হয়েছে, বেকারির হারও বেড়েছে অনেক। অথচ সরকারের যোজনা কমিশন নির্দ্বিধায় ঘোষণা করে দিল যে, এখন দেশের মানুষ নাকি আরও কম আয়ে বেঁচে থাকতে পারছে। ফলে সেই অনুযায়ী দারিদ্রসীমা নির্ধারণ করে বলেছে, শহরাঞ্চলে দৈনিক আয় ৩২ টাকার পরিবর্তে এখন ২৮ টাকা ৬৫ পয়সা বা তার কম হলে, এবং গ্রামে দৈনিক আয় ২৬ টাকার পরিবর্তে এখন ২২ টাকা ৪০ পয়সা বা তার কম হলে তাকে দরিদ্র ধরা হবে।

১৯৯৯-২০০০ সালে সুপ্রিম কোর্ট নিয়োজিত পূর্বতন বিচারপতি ডি পি ওয়াধা-র নেতৃত্বে দেশজুড়ে পর্যালোচনার পর প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা গেল, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি দেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা যা দেখাচ্ছে, বাস্তবে গরিবের সংখ্যা তার থেকে অনেক অনেক বেশি। রিপোর্ট দেখালো, সরকারের দারিদ্রসীমা নির্ধারণের মাপকাঠি চরম অবাস্তব। দৈনিক ১০০ টাকার কম আয় যাদের, তাদেরই দারিদ্রসীমার নিচে থাকা মানুষ বলে সুপ্রিম কোর্টের ওয়াধা রিপোর্টে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেই হিসেবে দেশে দারিদ্রসীমার নিচে থাকা মানুষের সংখ্যা ৮০ কোটি।

১২০ কোটির দেশে ৮০ কোটি মানুষ গরিবিসীমার নিচে অনাহারে অপুষ্টিতে দিনযাপন করে। কী মর্মান্তিক পরিস্থিতি দেশের! অথচ, রেডিও, টিভি ও সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার জোরদার প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে যে, দেশে নাকি উন্নয়নের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। ... প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং নানা অনুষ্ঠানে বেশ জোর দিয়েই বলেছেন, 'দেশে দারিদ্র নিশ্চয়ই কমছে'। ৫ বছর কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় থাকা বিজেপি সরকারের তৎকালীন অর্থমন্ত্রী যশোবন্ত সিনহাও বলেছিলেন, 'ভারতে দারিদ্র উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।' কেন্দ্রীয় প্ল্যানিং কমিশন তো একেবারে পরিসংখ্যান সহযোগে দেখিয়ে চলেছে, দেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কীভাবে কমে চলেছে।

২০০৯-১০ সালে প্ল্যানিং কমিশন দেখিয়েছিল, দেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা দেশবাসীর শতকরা ৩২ ভাগ। অথচ, ২০০৯-এর জুন মাসে কেন্দ্রীয় গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রক নিয়োজিত এন সি সাক্সেনা কমিটি সমীক্ষা করে দেখিয়েছিল, শতকরা ৪৯.১ ভাগ, অর্থাৎ দেশের প্রায় অর্ধেক মানুষই দারিদ্রসীমার নিচে চলে গিয়েছে।

২০০৭ সালে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অর্জুন সেনগুপ্তের নেতৃত্বাধীন 'ন্যাশনাল কমিশন ফর এন্টারপ্রাইজেস ইন দ্য আনঅর্গানাইজড সেক্টর' দেখিয়েছিল, দেশের শতকরা ৭৭ ভাগ মানুষের দৈনিক আয় ২০ টাকারও কম।

ক্রমবর্ধমান দারিদ্রের মর্মান্তিক ছবিটাকে গোপন করতে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কম করে দেখাতে সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিবারই চালাকির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। সরকারি উন্নয়নের সুফল ফলছে, দেশে দারিদ্র কমছে — এইটে প্রমাণ করা, দারিদ্রসীমার নিচে থাকা মানুষদের জন্য বরাদ্দ অর্থ ও খাদ্যশস্য যথাসম্ভব কমিয়ে দেওয়া এবং সেই কাজে প্রদত্ত ভরতুকি কমিয়ে পুঁজিপতিদের জন্য ভরতুকির পরিমাণ আরও বাড়ানো — এই পরিকল্পিত লক্ষ্যেই সরকার ও যোজনা কমিশন তাদের মাপকাঠি তৈরি করছে।

এখন ২০২০-২২ সালের মধ্যে দেশ থেকে দারিদ্র নির্মূল করবার যে ঘোষণা সরকারের প্ল্যানিং কমিশন করল, তাও দেশের মানুষ আর বিশ্বাস করে না। মানুষ নিজেদের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে জানে, এ সব ধাপ্পা, লোক ঠকানোর কৌশল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবজা থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর এ দেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যখনই দেশের পুঁজিপতিশ্রেণি করায়ত্ত করেছে, তখনই দেশে ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণির শোষণ-লুণ্ঠনের অর্থনীতি চালু হয়ে গিয়েছে। ৯০-এর দশক থেকে ভারত রাষ্ট্র বিশ্বায়ন তথা উদার অর্থনীতির অংশীদার হওয়ায় দেশের সাধারণ মানুষ দেশি-বিদেশি পুঁজির সম্মিলিত আরও ভয়াবহ লুণ্ঠনের শিকার হয়েছে। পুঁজিবাদী শোষণ-লুণ্ঠনের প্রক্রিয়াকে ক্রমাগত আরও ভয়ঙ্কর করে তুলছে সরকারগুলো, অথচ দেশ থেকে গরিবি 'ভ্যানিস' হয়ে যাচ্ছে আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের ছোঁয়ায় — মনমোহন সিং-এর কংগ্রেস সরকার দেশবাসীকে সেই চূড়ান্ত মিথ্যেটাই বিশ্বাস করতে বলছে। দেশের সব প্রাকৃতিক সম্পদ, শ্রমজীবী জনতার যা কিছু সৃষ্টি — সব লুঠ করবার যাবতীয় আইনি ব্যবস্থা কেন্দ্র এবং রাজ্যে রাজ্যে ক্ষমতাসীন সরকারগুলি দেশি-বিদেশি মালিকশ্রেণির জন্য করে যাবে, তবু দারিদ্র নাকি কমবে! দরিদ্রের সংখ্যা ও দারিদ্রের ভয়াবহতা বেড়ে চলারই এই অর্থনীতি — 'জল ঢেলে ফুটা পাত্রে বৃথা চেষ্টা তৃষ্ণা মেটাবারে'। সরকার এখন তো উন্নয়ন প্রকল্পগুলির বরাদ্দ ক্রমাগত কমিয়ে চলেছে, 'আর কত ভরতুকি দেওয়া যায়' — এই সব কথা বলে। অন্যদিকে পুঁজিপতিশ্রেণির জন্য নানা ধরনের করছাড় ও ভরতুকি দিয়েই চলেছে, তাদের জন্য হাজার হাজার কোটি টাকার ঋণমকুবও করে চলেছে। ফলে গরিব সাধারণ মানুষ অতীতে এই রাষ্ট্র থেকে যতটুকু সুবিধা পেত, তা থেকেও তারা বঞ্চিত হচ্ছে।

তাই একদিকে সাধারণ মানুষের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধির সংগ্রামকে জোরদার করার পাশাপাশি শোষণহীন নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দিকে আমাদের এগোতে হবে। যে নতুন সমাজে সামাজিক ও প্রাকৃতিক সম্পদ মুষ্টিমেয় অর্থবানদের লুঠ করার সুযোগ থাকবে না, সবটাই হবে শ্রমজীবী জনতার সম্পদ — সেই সমাজ প্রতিষ্ঠাই হবে লক্ষ্য।

কেরালাতেও এস ইউ সি আই (সি)-র গণআন্দোলন চলছে

চারের পাতার পর

শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে তৃণমূল স্তর থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে উচ্চ স্তর পর্যন্ত গণআন্দোলনের হাতিয়ার গণকমিটির জন্ম দেওয়া। আমাদের পার্টি শুরু থেকেই এই সংগ্রামে নিয়োজিত রয়েছে। কেরালায় ১৯৭০ সালের গোড়ার দিকে যখন দলের কাজ শুরু হয়, তখন থেকেই আমরা গণআন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করে আসছি। সেই সময়েই আমরা নারকেল ছোবড়া শিল্পের শ্রমিকদের মধ্যে ও কোল্লামের জেলেদের মধ্যে আন্দোলন গড়ে তুলেছি। এ রাজ্যে এস ইউ সি আই (সি) যে আন্দোলনের একটি শক্তি, এ কথা কেউই আজ আর অস্বীকার করতে পারবে না। কেরালার জেলায় জেলায় এস ইউ সি আই (সি) আন্দোলন গড়ে তুলছে। ত্রিবান্দ্রমের বিলাপ্পিলসালায় জঙ্গল জমা করার বিরুদ্ধে জনগণের যে আন্দোলন জয়যুক্ত হয়েছে, সেখানে এস ইউ সি আই (সি) নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করেছে। আলাপ্পুঝা জেলায় ব্ল্যাক স্যান্ড মাইনিংয়ের বিরুদ্ধে, এর্নাকুলাম জেলার মুলামপিল্লিতে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে, ১৭ ও ৪৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে রাস্তা চওড়া করার অজুহাতে জমি দখলের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলনগুলির প্রতিটিতে আমাদের পার্টি নেতৃত্ব দিচ্ছে। সম্প্রতি আমাদের পার্টি যে জাঠা সংগঠিত করেছিল সেটি রাজ্যের ১৪টি জেলা পরিক্রমা করে সেখানকার জনগণের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছে এবং দাবিপত্রে স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছে। স্বাক্ষরিত দাবিপত্রগুলি নিয়ে গোটা দেশের প্রায় ১ লক্ষ মানুষ ১৪ মার্চ ঐতিহাসিক পার্লামেন্ট অভিযানে সামিল হয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রীর কাছে দাবিপত্রগুলি জমা দেওয়া হয়েছে।

শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, রুচি-সংস্কৃতির উপর ভয়ঙ্কর আক্রমণ নেমে আসছে। কেরালায় স্কুলছাত্রদের অনেকে ১২ বছর বয়সে মদ খাওয়া শুরু করছে। সরকারের যে মদ নীতি যুবসমাজে মাদকাসক্তি বাড়াতে সাহায্য করছে, তার বিরুদ্ধে আমাদের দলের মহিলা সংগঠন এ আই এম এস এস আন্দোলন সংগঠিত করছে। কারণ, বিপ্লব শুরু করার আগে সমাজে তার পরিপূরক নতুন রুচি-সংস্কৃতির জন্ম দেওয়া অবশ্যপ্রয়োজনীয়। সে জন্য রুচি-সংস্কৃতির উপর শাসক শ্রেণির আক্রমণ প্রতিহত করা দরকার। আমরা ছোটদের সংঘবদ্ধ করি তাদের নিজস্ব সংগঠনের মধ্যে এবং উন্নততর রুচি-সংস্কৃতির ছোঁয়া তাদের দেওয়ার চেষ্টা করি। এভাবেই জীবনের সর্বক্ষেত্র পরিব্যাপ্ত করে সংগ্রাম গড়ে তোলার কাজে আমরা ব্রতী রয়েছি এবং দলের ৬৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করতে গিয়ে এই সংগ্রাম তীব্রতর করা ও উচ্চতর স্তরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শপথ নিচ্ছি। সাথে সাথে এই সংগ্রাম ও সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রতিষ্ঠিত এই মহান দলকে আরও শক্তিশালী করার জন্য মেহনতি জনতার কাছে আহ্বান জানাচ্ছি।

জয়নগরে দমকল কেন্দ্রের জন্য মন্ত্রীকে বিধায়কের চিঠি

জয়নগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক কমরেড তরুণ নস্কর দমকল মন্ত্রী জাভেদ আহমেদ খানকে ৯ মে এক চিঠিতে অবিলম্বে জয়নগর-মজিলপুর পুর এলাকায় একটি দমকল স্টেশন খোলার জন্য অনুরোধ জানিয়ে বলেন, জয়নগর মজিলপুর মিউনিসিপ্যালিটি ১৪০ বছরের পুরনো। জনসংখ্যাও অনেক। এখানে ৩৩টি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বহু বেসরকারি স্কুল, ৫টি বড় বাজার এবং ব্যবসা কেন্দ্র আছে। বারুইপুরের দমকল কেন্দ্রটির আওতায় পড়ে এলাকাটি। কিন্তু বারুইপুর এখান থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে। জয়নগর-মজিলপুর মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ থেকে ইতিপূর্বেই দমকল বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেলকে চিঠি দিয়ে এই জরুরি পরিষেবা কেন্দ্র তৈরি করার আবেদন জানানো হয়েছে, এজন্য প্রয়োজনীয় জমিরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমোদন অবিলম্বে দেওয়া হোক।

৬ মে ভাঙড়-১নং ব্লকের চন্দনেশ্বর হাইস্কুল সংলগ্ন মাঠে জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডলের সংসদীয় ক্ষেত্রের স্বাস্থ্যমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। স্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনা ও প্রদর্শনী, কুসংস্কারবিরোধী প্রদর্শনী ছাড়াও এক হাজারেরও বেশি মানুষকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়। শিশুরোগ, হৃদরোগ, স্ত্রীরোগ, অস্থিরোগ, নাক-কান-গলা, চক্ষু প্রভৃতির বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, সাধারণ চিকিৎসক ও হোমিও চিকিৎসকরা চিকিৎসা করেন। রোগীর প্রয়োজন অনুযায়ী ইসিজি, ইউএসজি, রক্তের সুগার পরীক্ষা, চক্ষু অপারেশন ও চশমা প্রদান এবং ঔষধ সরবরাহ করা হয়।২৯ এপ্রিল জয়নগর-২নং ব্লকের নয়পুকুরিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এবং ১৩ মে কুলতলী ব্লকের ভুবনেশ্বরী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একই ধরনের স্বাস্থ্যমেলা অনুষ্ঠিত হয়।

কমরেড কিম ইল সুঙ জন্মশতবর্ষ অনুষ্ঠানে কমরেড মানিক মুখার্জী

সমাজতান্ত্রিক উত্তর কোরিয়ার বিপ্লবের রূপকার ও প্রথম রাষ্ট্রপতি কমরেড কিম ইল সুঙের জন্মশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে গত ১১-১৬ এপ্রিল উত্তর কোরিয়ার রাজধানী পিয়ঙ ইয়ঙে সাত দিন ব্যাপী নানা অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য জন্মশতবর্ষ প্রস্তুতি কমিটির আমন্ত্রণে ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি ইমপিরিয়ালিস্ট কোঅর্ডিনেটিং কমিটির সাধারণ সম্পাদক এবং এস ইউ সি আই সি-র পলিটবুরো সদস্য কমরেড মানিক মুখার্জী সেখানে যান। ৪৪টি দেশ থেকে তিন শতাধিক ভ্রাতৃপ্রতিম প্রতিনিধি যোগ দেন। ভারত থেকে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি হিসাবে কমরেড মুখার্জী একাই আমন্ত্রিত ছিলেন। অন্যান্য দেশের বহু কমিউনিস্ট পার্টি আমন্ত্রিত ছিল। আমেরিকা, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, ভিয়েতনাম, পেরু, কঙ্গো সহ আরও বেশ কিছু আফ্রিকান দেশ থেকে প্রতিনিধি এসেছিলেন।

দুই কোরিয়ার একীকরণ নিয়ে আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন কমরেড মানিক মুখার্জী। একদা একটিই দেশ কোরিয়া সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি সমাজতান্ত্রিক উত্তর কোরিয়া, অন্যটি পুঁজিবাদী দক্ষিণ কোরিয়া। কমরেড মুখার্জী বলেন, পুনরায় এই একীকরণের অর্থ দু'টি দেশে যে দু'টি রাজনৈতিক ব্যবস্থা আছে, একটি সমাজতান্ত্রিক, অপরটি পুঁজিবাদী, এই দুই ব্যবস্থার মিলন নয়। আমরা চাই দুই দেশের জনগণের মিলন, ডেমোক্রেটিক পিপলস রিপাবলিক অব কোরিয়া এই উদ্দেশ্যে বহু উদ্যোগ নিয়েছে। ২০০০ সালে একবার জনগণের চাপে দক্ষিণ কোরিয়া সরকার একীকরণ অভিমুখে বিশেষ কিছু পদক্ষেপ নিতে রাজিও হয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গুলিহেলনে তারা শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে যায়। কারণ সাম্রাজ্যবাদীরা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে তার সবচেয়ে বড় শত্রু হিসাবে দেখে। কিন্তু বিশ্বের শান্তি এবং স্বাধীনতাপ্রিয় প্রতিটি মানুষ দুই কোরিয়ার একীকরণের দাবিতে উত্তর কোরিয়ার পাশে আছে। সাথে সাথে জনগণের ঐক্যবদ্ধ লড়াই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে সমগ্র কোরিয় ভূখণ্ড থেকে হাত ওঠাতে বাধ্য করবেই বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি উপস্থিত প্রতিনিধিদের নিজ নিজ দেশে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান, যাতে সেই আন্দোলন শেষ পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের শৃঙ্খলকে ধ্বংস করতে সক্ষম হয়।

কমরেড মানিক মুখার্জীর এটাই প্রথম উত্তর কোরিয়া সফর নয়। ইতিপূর্বে আফ্রো এশিয়ান সলিডারিটি কাউন্সিলের আহ্বানে যখন তিনি উত্তর কোরিয়া যান, তখনই তিনি পার্টিগত দ্বিপাক্ষিক আলোচনার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তার প্রতি মর্যাদা দেখিয়ে এবার কোরিয়ার পার্টি সেই আলোচনার ব্যবস্থা করেছিল। ওয়ার্কার্স পার্টি অব কোরিয়ার কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পলিটবুরো সদস্য, ভাইস ডিরেকটর ফর ফরেন রিলেসনস কমরেড পাক কুঙ গোয়াঙ-এর সাথে কমরেড মুখার্জীর ভারত এবং বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলন নিয়ে কথা হয়। এস ইউ সি আই (সি) গঠন প্রসঙ্গে কমরেড মানিক মুখার্জী তাঁর আলোচনায় দেখান, কেন অবিভক্ত সিপিআই একটি প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে গড়ে উঠতে পারেনি এবং বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ কী ধরনের বিশেষ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এস ইউ সি আই(সি) কে গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় আমাদের দেশের বিপ্লবের প্রয়োজনীয় সঠিক বিপ্লবী তত্ত্ব এবং লাইনের জন্ম দেন। কমরেড গোয়াঙকে তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষের রচনাবলী উপহার দেন এবং মার্কসবাদের অমূল্য ভাণ্ডারে কমরেড ঘোষ যে সংযোজন ঘটিয়েছেন, সংক্ষেপে তার উল্লেখ করেন। আলোচনার ভিত্তিতে স্থির হয় ভবিষ্যতে দুই কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে সম্পর্ক রক্ষিত হবে এবং দৃঢ় হবে।

এই সফরের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কমরেড মানিক মুখার্জী 'গণদাবী'র সাথে এক আলোচনায় বলেন, কোরিয়ার বিপ্লবের রূপকার ও সমাজতান্ত্রিক উত্তর কোরিয়ার প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে কমরেড কিম ইল সুঙ জনগণের গভীর শ্রদ্ধেয় নেতা। কীভাবে আজীবন কঠিন সংগ্রাম করে তিনি একটি উন্নত সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসাবে উত্তর কোরিয়াকে গড়ে তুলেছেন, জনগণ তা আবেগের সাথে স্মরণ করে। কিম ইল সুঙ নিজে একজন সামরিক যোদ্ধা ছিলেন, জাপানি সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে তিনি ১৯৩২ সালে গেরিলা যোদ্ধা বাহিনী তৈরি করে তার নেতৃত্ব দিয়েছেন। পরবর্তীকালে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধেও তাঁকে লড়তে হয়েছে। এই লড়াইতেই মাও সে তুঙ-এর আহ্বানে চীন থেকে স্বেচ্ছাসেবকরা গিয়েছিলেন। ঐ যুদ্ধে মাও সে-তুঙের সন্তান শহিদ হয়েছিলেন। সামরিক ক্ষেত্রে পারদর্শিতা অর্জনের সাথে সাথে মার্কসবাদ- লেনিনবাদের চর্চা করে কমরেড কিম ইল সুঙ স্বনির্ভরতার ধারণার উপর ভিত্তি করে উত্তর কোরিয়ায় সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্য পরিচালনা করেন, শিল্প- কৃষি ও সংস্কৃতিতে ব্যাপক অগ্রগতি ঘটান। ১৯৯৪ সালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

উত্তর কোরিয়ার ৮০ শতাংশ পাহাড়। চাষযোগ্য জমির পরিমাণ খুব কম। তাই খাদ্যশস্য নিয়ে তাদের একটা সমস্যা আছে। শুরু থেকেই শিল্পায়নের উপর তারা জোর দিয়েছে। ভারী যন্ত্রশিল্প গড়ে তুলেছে। স্টিল, কটন, কপার, মাইকা সহ নানা ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তুলেছে। এদের সোনার খনি বিশ্বের দ্বিতীয়। দেশীয় পদ্ধতিতে 'সৃজনশীল শ্রম'-এর ভিত্তিতে দেশ গড়ে তোলা, বিদেশ থেকে যতটা সম্ভব কম সাহায্য নিয়ে দেশের সম্পদের উপর সবচেয়ে বেশি নির্ভর করার কথা তাঁর 'জুচে আইডিয়া'তে বলেছেন কমরেড কিম ইল সুঙ। সেদেশে কলে কারখানায় শ্রমিকদের ৯টা থেকে ৬টা কাজের সময়। ২ ঘন্টা টিফিন। ক্যান্টিনে খাবারের দামের ৫০ শতাংশ শ্রমিকদের দিতে হয়। শ্রমিকদের জন্য বছরে ১০ থেকে ১৫ দিন বেড়াবার যাবতীয় খরচ রাষ্ট্র দেয়। এটা শ্রমিকদের সাংবিধানিক অধিকার, রাষ্ট্র মনে করে এর দ্বারা শ্রম আরও সৃষ্টিশীল হয়। ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে প্রত্যেকের শিক্ষা অবৈতনিক। এরপর যারা উচ্চশিক্ষা চায় তাদের সরকার স্টাইপেন্ড দেয়। যারা কাজ করতে চায় তাদের রাষ্ট্র কাজ দেয়। কাজ পাওয়া একজন কর্মক্ষম নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার। প্রত্যেককে বাসস্থান দেওয়া হয়। এসবের জন্যই দক্ষিণ কোরিয়ার নাগরিকদের মধ্যে দুই দেশের একীকরণের জন্য এত চাহিদা। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কারণে বেকারির অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করছে দক্ষিণ কোরিয়ার যুবকরা। জোর করে দেশ ভাগের কারণে উত্তর কোরিয়ার নাগরিকদের যে সমস্ত আত্মীয় স্বজনরা দক্ষিণ কোরিয়ায় থাকতে বাধ্য হয়েছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছে উত্তর কোরিয়ায় চলে আসার প্রবল আকুতি।

ও দেশের সংবিধান অনুযায়ী প্রতিটি নাগরিক বিনামূল্যে চিকিৎসা পাওয়ার অধিকারী। ওষুধ যেহেতু বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয় এবং তার দাম অনেক, তাই তারা ভেষজ ওষুধ তৈরির উপর জোর দিয়েছে, তার ব্যবহারও ব্যাপক। বিজ্ঞানের প্রযুক্তিগত এবং মৌলিক দিক ওখানে খুব যত্ন সহকারে স্কুলের প্রাইমারি স্তর থেকেই পড়ানো শুরু হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নানা বিষয়ে ছাত্ররা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রশিক্ষিত শিক্ষকদের সাহায্যে। প্রতিটি স্কুলে ছাত্র ছাত্রীদের গান ও নানা বাদ্যযন্ত্র শেখানো হয়। দেশের ছেলে মেয়েদের খুব ছোট থেকে নানা ধরনের শারীর শিক্ষা অবশ্যই নিতে হয়।

কমরেড মুখার্জী বলেন, উত্তর কোরিয়ায় রাস্তা-ঘাটে, বিজ্ঞাপনে, টিভি, সিনেমায় কোথাও অশ্লীলতা ও কুরুচির প্রদর্শনী দেখা যাবে না। কমরেড কিম ইল সুঙ সংস্কৃতির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। ওদের সংবিধানে বলা আছে, ক্রমাগত সংস্কৃতি চর্চার মান বাড়িয়ে সমগ্র সমাজকে সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির ভিত্তিতে দাঁড় করাতে হবে। টিভিতে বিবিসি, সিএনএন-এর খবর দেখা যায়, কিন্তু বিজ্ঞাপন সেন্সর করা হয়।

উত্তর কোরিয়াতে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সুপ্রিম অ্যাসেম্বলি বা সর্বোচ্চ আইনসভার নির্বাচন হয়। একেবারে নিম্নস্তরে প্রথমে ডেপুটিদের নির্বাচন হয়, তারপর ধাপে ধাপে একেবারে উপরের স্তরে যায়। এই আইনসভা চাইলে সরকার ও রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদাধিকারীকেও 'রিকল' (ফিরিয়ে আনা) করতে পারে।

উত্তর কোরিয়াকে একটি লৌহপ্রাচীর ঘেরা দেশ মনে হয় ঠিকই, কিন্তু দেশের ভিতরে নাগরিক জীবন প্রাণচঞ্চল, সজীব। এত গোপনীয়তার কারণও দুর্বোধ্য নয়। জন্মলগ্ন থেকেই সমাজতান্ত্রিক এই দেশটির বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধচক্রান্ত অব্যাহত। চারদিক ঘিরে রয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী সমরসজ্জা। দেশের ভিতরে অন্তর্ঘাতমূলক কাজ করানোর জন্য সাম্রাজ্যবাদী ও দক্ষিণ কোরিয়ার ষড়যন্ত্র প্রতিনিয়ত সক্রিয়। এই অবস্থায় উত্তর কোরিয়াকে একদিকে সমরাস্ত্রে স্বনির্ভর হতে হচ্ছে, অপরদিকে অন্তর্ঘাতমূলক ষড়যন্ত্র আটকাতে সদা সর্বদা কড়া সতর্কতা জারি রাখতে হচ্ছে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের শত হুমকির কাছেও উত্তর কোরিয়া মাথা নত করবে না দেশের মানুষের মধ্যে এই দৃঢ় প্রত্যয় সর্বত্রই।

নারী সমস্যা প্রসঙ্গে আলোচনা সভা

অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের কলকাতা জেলা কমিটির উদ্যোগে ২ মে মহাবোধি সোসাইটি হলে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য বিষয় — 'বর্তমান আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে নারীজীবনের সমস্যা ও কর্তব্য এবং রবীন্দ্রনাথের গল্প 'স্ত্রীর পত্র'। সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী ও এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সাধনা চৌধুরী।

রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্রে' নারী জীবনের যে সমস্যা তুলে ধরা হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করেন দলের কলকাতা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড বিপ্লব চক্রবর্তী। সাধারণ মহিলারাও উৎসাহের সাথে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

কমরেড সাধনা চৌধুরী আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, আমাদের দেশের মতো একটা পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় নারী-পুরুষ উভয়েই শোষিত, নির্যাতিত। আর মহিলারা এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজে, পরিবারে কোথাও পুরুষের সমান অধিকার পায়নি। সে অর্থে নারী দু'ভাবে শোষিত হচ্ছে। পুঁজিবাদের সংকট বাড়ার সাথে সাথে মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংকটও তীব্রতর হচ্ছে। স্বার্থপরতা, ভোগবাদী মানসিকতা দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে, মনুষ্যত্ব, নীতি-নৈতিকতার অবনমন ঘটছে, অশ্লীলতা-অপসংস্কৃতি বাড়ছে। তার শিকার মহিলারাও। সাথে সাথে বাড়ছে নারী-নির্যাতন, নারীপাচার, গণধর্ষণ, ইভটিজিং। এসব বন্ধ করতে হলে বলিষ্ঠতার সাথে মেয়েদের এগিয়ে আসতে হবে।

'আশা' কর্মীরা রাজপথে

ইনসেনটিভ নয়, আশা কর্মীদের নিয়মিত সরকারি স্বাস্থ্য কর্মচারীর স্বীকৃতি ও তাদের মতো বেতন দেওয়ার দাবি তুলেছে পশ্চিমবঙ্গ 'আশা' কর্মী ইউনিয়ন। যতদিন তা না দেওয়া হচ্ছে ততদিন রাজ্যের ক্যাজুয়াল কর্মীদের মতো মাসিক ৬,৬০০টাকা বেতন দিতে হবে, তাঁদের প্রভিডেন্ট ফান্ড, ই এস আই, পেনশন সহ সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের আওতায় আনতে হবে। মোট ১৬ দফা দাবিতে ৭ মে আরামবাগ মহকুমা শাসকের নিকট তিনশতাধিক আশা কর্মী বিক্ষোভ দেখান। আরামবাগ বাস স্ট্যান্ডে সারাদিনব্যাপী অবস্থান হয়। এ আই ইউ টি ইউ সি রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড লিলি পালের নেতৃত্বে পাঁচ জনের প্রতিনিধি দল মহকুমা শাসকের সঙ্গে সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করেন। অবস্থানে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের হুগলি জেলা যুগ্ম সম্পাদিকা সুমনা রায়, কমিটির অন্যতম সদস্য লিলি ভট্টাচার্য, আবেদা খাতুন, হুগলি জেলা সভাপতি কমরেড তাপস দাস প্রমুখ।

বিধায়ক অধ্যাপক তরুণ নস্করের চিঠি

একের পাতার পর

(৩) কিন্তু কলেজগুলির পরিচালন সমিতিতে পূর্বতন সরকারের মতোই বিধায়ক, সাংসদ, মন্ত্রী থেকে শুরু করে শাসক দলের নানা স্তরের নেতাকে মনোনীত করা হল। বিধানসভার গত অধিবেশনে ২ এপ্রিল আমার এক প্রশ্নের উত্তরে এই বিষয়ে যে অনেক তথ্যই উদঘাটিত হয়েছে তা নিশ্চয় আপনার স্মরণে আছে। এর ফলে বর্তমান সরকারের ঘোষিত অভিপ্রায় সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে কলেজগুলিতে দলীয় অনুপ্রবেশ বন্ধ করার পদ্ধতি সম্পর্কে আমার কিছু সুনির্দিষ্ট পরামর্শ আপনার কাছে রাখতে চাই —

(ক) সমস্ত পরিচালন সমিতি থেকে এখনই বিধায়ক, সাংসদ, মন্ত্রী থেকে শুরু করে শাসক দলের সকল মনোনীত ব্যক্তিদের প্রত্যাহার করতে হবে।

(খ) উক্ত পরিচালন সমিতিগুলি যাতে শিক্ষক-শিক্ষাবিদদের দ্বারাই কেবলমাত্র গঠিত হয় তার জন্য প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধন করতে হবে।

(গ) সমগ্র বিষয়টি সম্পর্কে এখনই শিক্ষক সংগঠন ও শিক্ষাবিদদের মতামত নিতে হবে।

R.N.I. No 5268 / 60
Postal Registration No. KOL / RMS / 138 / 2010-12

স্ট্যালিনবিরোধী কুৎসার বিরাম নেই

আজ ক্রুশ্চেভ বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই আফশোস করতেন। সোভিয়েট সমাজতন্ত্র ধ্বংস করার জন্য স্ট্যালিনের নেতৃত্ব ও মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করতে বিংশতি কংগ্রেসের 'গোপন' বক্তৃতায় স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে তিনি ভুরি ভুরি কুৎসা ও অভিযোগের তালিকা পেশ করেছিলেন। যদিও তার একটিরও প্রমাণ মেলেনি। কিন্তু, সম্প্রতি লন্ডনের কী এক সভায় কোনও এক চিকিৎসক স্ট্যালিনের নামে লেনিনকে বিষ প্রয়োগ করে হত্যার যে অভিযোগটি তুলেছেন, ক্রুশ্চেভ সেই অভিযোগের কথা ভাবতে পারেননি। হয়তো বা ভেবেছিলেন, কিন্তু পাকা বুদ্ধির জোরে বুঝেছিলেন, অসুস্থ লেনিনের শেষ জীবন কেটেছে প্রকাশ্যে, দেশের সেরা চিকিৎসক ও পার্টির নেতৃত্বের তত্ত্বাবধানে। এই অবস্থায় 'স্ট্যালিন বিষ প্রয়োগ করে লেনিনকে হত্যা করেন' এই অভিযোগ তুললে ক্রুশ্চেভের অনেক সাধের মিথ্যার হাঁড়ি একেবারে হাটের মাঝে ভেঙে যেত।

কিন্তু ক্রুশ্চেভ যা পারেননি, স্ট্যালিনের ঘোরতর শত্রু ট্রটস্কি পর্যন্ত যা ভাবেননি, ট্রটস্কির সমর্থক আইজাক ডয়েৎসার তাঁর লিখিত 'স্ট্যালিন -জীবনী'-তে যা লেখার কথা চিন্তাও করেননি, আজ এতকাল পরে লন্ডনের কোনও এক চিকিৎসক তা ভাবলে ও প্রকাশ্য সভায় ব্যক্ত করলে আশ্চর্যের কিছু নেই। কারণ, সাম্রাজ্যবাদী দানব ও সংশোধনবাদী দালালদের কল্যাণে গত ৬০ বছর ধরে মহান স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে কুৎসার যে বন্যা বইয়ে দেওয়া হয়েছে, তার পর রাম-শ্যাম-যদু-মধু যে কেউ স্ট্যালিন সম্পর্কে যে কোনও কুৎসা অনায়াসে করতে পারে এবং বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যম মুখিয়ে আছে তা প্রচার করার জন্য। লন্ডনের সভায় ঐ চিকিৎসকের ভাগ্যেই রয়েছে, তিনি বিশ্বাস করেন, স্ট্যালিনই বিষ প্রয়োগ করে লেনিনকে হত্যা করেছিলেন। এবং তাঁর এই 'বিশ্বাস' প্রমাণ করার জন্য তিনি গবেষণা করবেন। অর্থাৎ কোনও প্রমাণ তাঁর হাতে নেই, গবেষণাও তিনি ভবিষ্যতে করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন মাত্র। অথচ এ হেন অর্বাচীনের ততোধিক অর্বাচীন একটি অভিযোগ সংবাদমাধ্যম বড় বড় অক্ষরে ছেপে প্রচার করে দিল।

বর্তমান প্রজন্ম, যারা জ্ঞান হওয়া অবধি স্ট্যালিনবিরোধী কুৎসা শুনতেই অভ্যস্ত এবং ইতিহাস জানে না, তারা হয়তো এটাও সত্য বলে ধরে নেবে। এছাড়াও একদল আছেন, যাঁরা ছাপার অক্ষরে সংবাদমাধ্যমে যে কথাই বেরোয়, তাকেই সত্য বলে ধরে নেন। এই দুই মহলের জন্যই ইতিহাস থেকে একটি তথ্য উল্লেখ করা যেতে পারে।

১৯১৭ সালে রাশিয়ার ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর স্ট্যালিন যখন জেল থেকে বাইরে আসেন, তখনও লেনিন বিদেশে নির্বাসন থেকে দেশে পৌঁছতে পারেননি। এরপর লেনিন বিদেশ থেকে রাশিয়ায় আসেন। রাশিয়ায় তখন সদ্য ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বুর্জোয়া কেরেনস্কি সরকার লেনিনের বিরুদ্ধে পূর্বতন জার সরকারের নানা অভিযোগ দেখিয়ে লেনিনকে আত্মসমর্পণ করতে বলল এবং ন্যায়বিচারের প্রতিশ্রুতি দিল। ট্রটস্কি ও জিনোভিয়েভের মতো নেতারা লেনিনকে আত্মসমর্পণ করারই পরামর্শ দেন। লেনিনের স্ত্রী ক্রুপস্কায়া লিখেছেন, এ খবর শুনে স্ট্যালিন উদ্বিগ্ন হয়ে ছুটে আসেন এবং লেনিনকে বলেন, আত্মসমর্পণ করলে কেরেনস্কিরা লেনিনকে হত্যা করবে। স্ট্যালিন লেনিনকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে তাঁর জীবন রক্ষা করেছিলেন। স্ট্যালিন না থাকলে বিশ্ব সেই সময়েই লেনিনকে হারাত।

স্ট্যালিনের মৃত্যু হয়েছে ৬০ বছর, সোভিয়েট সমাজতন্ত্রেরও পতন হয়েছে। তবুও স্ট্যালিনবিরোধী কুৎসার বিরাম নেই কেন? কারণ, স্ট্যালিন মানেই সমাজতন্ত্রের প্রতীক, পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীদের ঘোরতর আতঙ্ক। আজ আবার রাশিয়ায় মানুষ অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বুঝতে শুরু করেছে, কী তারা হারিয়েছে, কী তারা পেয়েছিল স্ট্যালিনের মহান নেতৃত্বে। ফলে আজ রাশিয়ার বুকে আবার লেনিন-স্ট্যালিনের ছবি হাতে মিছিল চোখে পড়ছে। এখানেই ভয় পাচ্ছে দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদীরা ও তাদের সংশোধনবাদী দোসররা।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বাজেট বরাদ্দ বিতর্কে কমরেড তরুণ মণ্ডল

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বাজেট বরাদ্দ সমর্থন প্রসঙ্গে ২ মে ডাঃ তরুণ মণ্ডল বলেন, এই ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকভাবে সমর্থন জানানোর কোনও প্রয়োজনই নেই, কারণ স্বরাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ কখনই কমানো হয় না। বরাদ্দ কমানো হয় শিক্ষা খাতে, স্বাস্থ্য খাতে।

ডাঃ তরুণ মণ্ডল বলেন, ইনসারজেন্সি, সন্ত্রাসবাদ, মাওবাদ ইত্যাদি রোখার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ইউ এ পি এ, এন সি টি সি, এন এস এ ইত্যাদির মতো যে সব আইন নিয়ে এসেছেন, সেগুলি রিভিউ করে দেখা দরকার যে এ সব আইন চালু করার পর সমস্যাগুলি কমেছে, না বেড়েছে। এই রিভিউ অত্যন্ত জরুরি, কারণ আমি মনে করি, উদ্দেশ্য হিসাবে যাই বলা হোক, বাস্তবে এ সব আইন জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকারকেই খর্ব করে। ফলে এগুলির প্রত্যাহার দরকার।

তিনি আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহলে যৌথবাহিনী রাখার কোনও প্রয়োজন নেই। বরং তাদের নিয়োগ করা হোক রাজ্যে বিভিন্ন স্থানে লুকিয়ে রাখা বেআইনি অস্ত্র উদ্ধারের কাজে। তিনি বলেন, সারা দেশেই পুলিস ও আধা সেনা জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। মিছিল, মিটিং করতে চাইলে পুলিশ এমন ব্যবহার করছে যা কোনও সভ্য দেশে ভাবা যায় না। থানার ভেতরে পুলিশ অত্যাচার করছে, এমনকী মহিলাদেরও রেহাই নেই। এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ পুলিসকে মেনে চলতে হবে। শিশু ও নারীপাচার অবাধে চলছে। দলিত, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ও সংখ্যালঘুদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ হচ্ছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দায়িত্ব এগুলি খুঁটিয়ে বিচার করা। ডাঃ মণ্ডল বলেন, আসামে জনগণনা রিপোর্ট তৈরি করতে গিয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হচ্ছে, যা অত্যন্ত অন্যায়। 'আধার' পরিচয়পত্র সম্পর্কে তিনি বলেন, এই পরিচয়পত্র তৈরি করতে গিয়ে, সভ্য সমাজে যে মৌলিক অধিকারগুলি থাকে, তার উপর হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, পুলিশ দপ্তরে যে দুর্নীতি চলছে এবং সমাজবিরোধী ও দুর্বৃত্তদের সাথে পুলিশের দহরম-মহরম দেখা যাচ্ছে, তা বন্ধ করা দরকার। ভুয়া সংঘর্ষ বন্ধ হওয়া দরকার। পুলিশের আচরণ অসাম্প্রদায়িক হওয়া দরকার। গোধরা, অযোধ্যা প্রভৃতি ঘটনায় আমরা দেখেছি, পুলিশের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক মনোভাব না থাকার কারণে গভীর বিপদের সৃষ্টি হয়েছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে দলিত ও দরিদ্র মানুষজনের উপর কায়েমি স্বার্থের নির্মম অত্যাচার চলছে। পুলিশ নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। এ দিকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অবিলম্বে নজর দেওয়া দরকার।

হিলারিরা ভারতবাসীর কল্যাণের জন্য আসে না

একের পাতার পর

যে, এর দ্বারা নাকি মাল্টিন্যাশনালদের কাছে ভুল বার্তা যাবে। সেই সিপিএম নেতারাই এখন সরকার হারিয়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভেক ধরে হিলারির সফরকে কত না কটাক্ষ করছেন। এ রকম জঘন্য দ্বিচারিতাই সিপিএমের বৈশিষ্ট্য।

বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির প্রতিনিধিরা কেউই এ রাজ্যের উন্নয়নের কথা ভেবে ছুটে আসে না। আসে নিজ নিজ দেশের পুঁজিপতিদের জন্য বাজারের খোঁজে। তৃণমূল মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের আগে এক আলোচনা সভায় হিলারিকে যখন তাঁর কলকাতা সফরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, তিনি বলেন, ''আমার কলকাতা সফরের অন্যতম উদ্দেশ্য খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগ এবং তিস্তা চুক্তি নিয়ে আলোচনা।'' এর একটি মার্কিন পুঁজির ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত, অপর একটি এই উপমহাদেশে মার্কিন আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সামরিক-রাজনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে জড়িত।

কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকারের তথাকথিত সংস্কার কার্যক্রমের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, ভারতের খুচরো ব্যবসা ক্ষেত্রটিকে বিদেশি পুঁজির জন্য খুলে দেওয়া। স্বভাবতই মার্কিন পুঁজি ভারতের খুচরো বাজারে ঢুকতে চায়। ইতিমধ্যে ভারত-মার্কিন সামরিক-আর্থিক সমঝোতা যে স্তরে গেছে, যে ভাবে সাম্রাজ্যবাদী উচ্চাকাঙ্খা নিয়ে চলা ভারতীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্র মার্কিন সামরিক জোটের শরিক হয়েছে এবং মার্কিন সরকারও ভারতকে নির্ভরযোগ্য পার্টনার বলে স্বীকৃতি দিয়েছে তাতে ভারতের বাজার আরও খোলার জন্য মার্কিন চাপ আসবেই। আমরা বলি, এ চাপের পিছনে রয়েছে লেনদেনের স্বার্থ। ভারতীয় পুঁজিও আজ মাল্টিন্যাশনাল হয়ে বিদেশের বাজারে খাটছে, মুনাফা করছে। ভারতের বাজার বিদেসি পুঁজির জন্য না খুললে ভারতীয় পুঁজির সেই বিদেশের বাজারে টান পড়তে পারে। ফলে বিদেশ থেকে চাপ এলে ভারতকে তা মানতেও হবে, এটাই লেনদেনের ফর্মুলা। এ কথা সকলেই জানেন, খুচরো ব্যবসা খোলা নিয়ে কেন্দ্রীয় আইনের বিরোধিতা করেছে ইউ পি এ শরিক তৃণমূল কংগ্রেস। বাজারের জন্য মরিয়া মার্কিন সরকার তাই সম্ভবত মনমোহন-প্রণব-সোনিয়ার পরামর্শেই সরাসরি পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল সরকারের সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসার পথ বেছে নিয়েছে। খুচরো ব্যবসার বাজার খোলার প্রশ্নে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরোধিতার মধ্যে নীতিগত বিষয় কিছু নেই। সদ্য প্রতিশ্রুতি দিয়ে সরকারে বসেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এখনই অন্যরকম বললে জনমনে বিরূপতার সৃষ্টি হবে। সাথে সাথে এই ইস্যুকেও তৃণমূল কংগ্রেস কেন্দ্রের উপর চাপ দিয়ে টাকা আদায়ের একটা হাতিয়ার হিসেবেই ব্যবহার করতে চায়। বিনিয়োগের টোপ দিয়ে এই জায়াগাটাই নরম করতে এসেছিলেন হিলারি ক্লিন্টন। কৃষিজমি অধিগ্রহণ, এস ই জেড প্রভৃতি প্রশ্নে তৃণমূল নেত্রী যেভাবে একের পর এক তাঁর পূর্ব প্রতিশ্রুতি থেকে সরে এসে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষায় মনযোগী হচ্ছেন তাতে খুচরো ব্যবসার প্রশ্নেও তাঁর ভবিষ্যত অবস্থান বোঝা দুঃসাধ্য নয়। একদা অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডুর কথা মনে পড়ে? 'হাইটেক মুখ্যমন্ত্রী' নাম দিয়েছিল তাকে মিডিয়া, তদানীন্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ক্লিন্টন এসে চন্দ্রবাবুর সাথে করমর্দন করে গিয়েছিলেন। সে কি তৃণমূল হর্ষধ্বনি! আজ কোথায় সেই 'হাইটেক', কোথায় সেই চন্দ্রবাবু!

তিস্তা জলবণ্টন চুক্তি ভারত-বাংলাদেশের একেবারেই দ্বিপাক্ষিক বিষয়। আলাপ-আলোচনার মধ্যে দিয়ে নিজ নিজ দেশের স্বার্থরক্ষা করেই উভয় দেশকে তা মেটাতে হবে। অথচ ভারত সরকার লক্ষণীয় ভাবে তৃতীয় শক্তি হিসাবে আমেরিকাকে এই ইস্যুতে মাতব্বরি করার অনুমতি দিয়ে দিল। এ ধরনের দ্বিপাক্ষিক ইস্যুতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে হস্তক্ষেপ করতে দেওয়ার ফলাফল যে ভবিষ্যতে অত্যন্ত বিপজ্জনক হতে পারে, সে বিষয়ে উভয় দেশের জনগণ সজাগ ও সতর্ক থাকবেন বলেই আমরা আশা করি। আসলে ভারত-মার্কিন যে সামরিক পার্টনারশিপ গড়ে উঠেছে, বাংলাদেশকে তার শরিক করে নিতে চায় এই দুই শক্তিই।

বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, শিক্ষা ও চিকিৎসায় মার্কিন বিনিয়োগ আসবে। এর মানে তো বড় বড় নার্সিংহোম, বড় বড় স্কুল-কলেজ। যার চার্জ ও টিউশন ফি-র অঙ্ক শুনলে সাধারণ মানুষ জ্ঞান হারায়। এতে রাজ্যের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের কী লাভ?

পরিশেষে বলি, হিলারি হচ্ছেন সেই রাষ্ট্রের প্রতিনিধি, যারা ইরাককে ধ্বংস করেছে, লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে, আফগানিস্তানে প্রতিদিন মানুষ মারছে, পাকিস্তানকে বধ্যভূমিতে পরিণত করেছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কুকীর্তির তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতরই হয়ে চলেছে। তাঁবেদার মিডিয়ার হর্ষধ্বনিতে সাধারণ মানুষ তাই বিভ্রান্ত হতে পারে না।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৬০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২২৭-৬২৫৯, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci-c.in